আবুযর রেজওয়ান

বিশ্বায়ন ও অন্যান্য

প্রচ্ছদ | ইয়াহ্ইয়া ফজল

বিশ্বায়ন ও অন্যান্য

আবুযর রেজওয়ান

বিশ্বায়ন ও অন্যান্য

প্রকাশকাল
অমর একুশে বইমেলা ২০১০

প্রকাশক
শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রঃ) ফাউন্ডেশন, সিলেট।

পরিবেশক
মুক্তস্বর
গাজী বোরহান উদ্দিন মার্কেট, বন্দরবাজার, সিলেট।
ফোন : ০১৭২৪-৮৮৩০৩৩
muktasshar@gmail.com

প্রচ্ছদ
ইয়াহইয়া ফজল

মুদ্রক
পানশী
ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ড শপিং সিটি (লেভেল-৬)
জিন্দাবাজার সিলেট। সেল: ০১৭১১-০৪৪৮৮৬

দাম
আশি টাকা

Bisshayon o onnanno by Abujor Rejwan
Presented by Muktassar, Gazi Burhanuddin Maket, Bondor Bazar Sylhet. Phone : 01724-883033, e-mail: muktasshar@gmail.com
First Edition : Ekushe Boimela Dhaka 2010
Price: Tk. 80 $ 2 £ 2

উৎসর্গ

আল্লামা বশীর উদ্দিন শায়খে গৌড়করণী (রহ.), সত্যের পতাকাবাহী অকুতোভয় সিপাহসালার, জ্ঞানে দীপ্তিময় একটি সূর্য; আমার লেখাগুলো যদি তাঁর সান্নিধ্য স্পর্শ করতে পারতো!

আমার দাদাদাদি, যাদের দেখার অতৃপ্তি নিয়ে জন্মেছিলাম, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায়।

আমার নানা আরশের মালিকের কাছে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তার শিয়রে বসে কুরআন পাঠ করছিলাম, এ সময় তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে কী যেনো বললেন।

আমার আব্বা-আম্মা, আদর্শিক চেতনা থেকে কোনো কিছুই যাদের ঠলাতে পারে নি, সংসারের প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা আমাদের মানুষ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, তার দীর্ঘ জীবন কামনায়।

হাফিয জালাল উদ্দিন, আমার শিক্ষক, নিভৃতে বসলে এখনো যার একটি কথা কানে বাজে–'রেজওয়ান, সবক শোনাও'।

নার্গিস খালাম্মা, একজন মহিয়সী নারী, মানবিক মূল্যবোধে জ্যোতির্ময় একটি প্রাণ, তার সুস্থ জীবন কামনায়।

ইমরান, জাকারিয়া, মাহবুব; একটি দুঃসময়ের সাক্ষী যারা, তাদের আত্মার আর্তনাদ দেখেছি আমি আমার সবগুলো অনুভূতি দিয়ে, তারা ভলো থাকুক চিরকাল

ভূমিকা

মানুষের জীবনটাই এমন যে, অবিশ্বাস্য কতো কিছুই না ঘটে যায়। এতো তাড়াতাড়ি বই বের করে ফেলবো, ভাবি নি। তবু বই বেরোলো। আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন, যারা পরম মমতায় অন্যকে স্বপ্ন দেখান, স্বপ্ন ফেরি করেন। সাংবাদিক ফায়যুর রাহমান এমনই একজন ফেরিওয়ালা। তাঁর জাদুকরী অনুপ্রেরণা আমাকে এতো দূর নিয়ে এসেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এ বইয়ের আপাতবিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলো ঐক্যবদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় আগ্রহে, সে আগ্রহ শোষণ-বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তির স্বপ্নে। প্রবন্ধগুলোতে চেষ্টা করা হয়েছে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে। আলোচনার মূল এলাকা বাংলাদেশ, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই অন্য দেশের কথাও এসেছে। পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া আগ্রাসন থেকে এক মুঠো জন্মভূমিকে রক্ষার স্বপ্ন দেখানো হয়েছে এতে।

প্রবন্ধগুলোর কয়েকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি নতুন। বইটি পরিমার্জনের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর সালমান আহমদ ও হোসাইন আহমদ মাসুম। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য শাহ ওলীউল্লাহ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ।

আবুযর রেজওয়ান
rejwansyl@gmail.com

পাঠক্রম

বিশ্বায়ন : পুঁজিবাদী শোষণের আধুনিক শিল্পকলা

শোষণকে কি শিল্পকলা বলা যায় ? যায় না। তবে পুঁজিবাদী শোষণকে শিল্পকলা না বলে উপায় কী। এ যুগে কত কিছুই না শিল্প হয়, নারীকে নগ্ন করে প্রদর্শন করা, পশুর সাথে মানুষের যৌনাচার, মানুষকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা, এসব আজ শিল্পে পরিণত হয়েছে।
তাহলে পুঁজিবাদী শোষণকে শিল্পকলা বললে মন্দ হবে কী? পুঁজিবাদী শোষণে মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। আবার সেই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ছবিগুলো হয় শিল্পকলা। পুঁজিবাদীরা সেই ছবিগুলো দিয়েই বিশ্বে ধুমধাড়াক্কা ব্যবসা করে। শিল্প এখন আর সৃষ্টির আনন্দ নয়, পুঁজিবাদের কল্যাণে শিল্প এখন ব্যবসার মাধ্যম। অর্থ-ই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ও মানদন্ডের জায়গা দখল করে নিয়েছে। শোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর পৃথিবী উন্মুক্ত হল পুঁজিবাদের জন্য। পুঁজিবাদের ধর্মই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোগ, অর্থ-ই এখানে সবকিছুর মানদন্ড, সুতরাং তারা পৃথিবীর উপর নিজেদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। শুধু অর্থনীতি বললে ভুল হবে, পৃথিবীর জাতি রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তারা গ্রহণ করল ভিন্ন কৌশল। পূর্বেকার সম্রাজ্যবাদী শক্তির মতো আধিপত্য তারা বিস্তারে হুট করে দেশ দখল করার পথে এগোলো না। পৃথিবীকে তারা একটি ফ্রেমের ভেতর নিয়ে আসতে চাইল, যেখানে পৃথিবীকে মনে হবে একটি গ্রাম, আর দেশগুলোকে এক-একটি পরিবার, যা পৃথিবীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে তো বটেই, এর সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিয়ে আসবে আমূল পরিবর্তন । জাতিগুলোর শিক্ষা ও আদর্শিক ফান্ডামেন্ডাল বিনষ্ট হবে। সুতরাং তারা বিশ্বের নতুন রূপরেখা উপস্থাপন

করল। যেহেতু তা কোন ভৌগোলিক সীমানা মানে না, তাই এর নাম দিল বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীতে মুক্তবাজার বাণিজ্যের পথ খুলে গেল। পুঁজিবাদীরা মাকড়শার জালের মতো দূর্বোধ্য করে বিশ্ববাজারের নকশা প্রদান করল। ফলে বিশ্ববাজার পশ্চিমা পণ্য, বিশেষ করে আমেরিকার পণ্যগুলোর রমরমা ব্যবসার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। অন্যরা সেখানে সুবিধা করে উঠতে পারল না। বিশ্বের বাজার ও বিশ্বের মানুষ আটকা পড়ল বিশ্বায়ন নামক শোষনের আধুনিক শিল্পকলায়। এই শিল্পকলার মারপ্যাঁচে আটকা পড়ে জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হল আত্মপরিচয় সংকটের। যার প্রমাণ তাদের রাজনৈতিক সংকট ও ঘন ঘন ক্ষমতার পালাবদল। বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষনায় দেখা যায় তারা আত্মপরিচয় সংকটে ভুগে নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশ্বাস পরিত্যাগের ফলে। জাতিগুলোকে স্বীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাস থেকে দুরে সরিয়ে রাখার এ কাজটি করেছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের বড় সফলতা এখানেই।

শিল্পকলা যেমন কঠিন বিষয়, বিশ্বায়ন তার চেয়েও অনেক জটিল। বিশ্বায়নের যথাযথ সংজ্ঞা না থাকায় ধারনাটির সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করানো তাই বেশ মুশকিল। একেক জনের কাছে বিশ্বায়নের একেক অর্থ, ব্যাপক অর্থে বিশ্বায়ন বলতে বিভিন্ন দেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রের একত্রিত হওয়ার তীব্র প্রবণতাকে বোঝায়। অন্য অর্থে বিশ্বায়ন বলা যায়, যার মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো সীমারেখা থাকবে না। পুঁজির সরবরাহ ও প্রবাহ অবাধ থাকবে। তবে বিশ্বায়ন ধারনাটি শুধু অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট নয়। অনেকে বিশ্বায়নকে অর্থনীতের সাথে সম্পৃক্ত করে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেন। আমাদের কাছে এ বিশ্লেষণকে যথার্থ মনে হয় নি। কারণ বিশ্বায়নের সাথে অর্থনীতি বর্হিভূক্ত অনেক প্রক্রিয়াও জড়িত। বিশ্বায়ানকে বিচার করতে হবে পুঁজিবাদের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে, নয়তো এ সংক্রান্ত যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আংশিক রয়ে যাবে।

প্রকৃত সত্য হলো, বিশ্বায়ন কোন প্রাকৃতিক কিংবা স্বয়ম্বর প্রক্রিয়া নয়। চরিত্রগত ভাবেই এটি হচ্ছে একটি অসম প্রক্রিয়া। এখানে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট। এটি হয়েছে, একটি শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর, একটি দেশের উপর অন্য দেশের প্রাধান্য দেওয়ার কারণে। পুঁজির মালিকরাই এখানে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। এই বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে, লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের কারণে। পুঁজির মালিক ও ব্যবস্থাপকরা কম্পিউটার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন বিলিয়ন ডলার এক দেশ থেকে অন্য দেশে কোন রকম ঝুট ঝামেলা ছাড়াই আদান প্রদান করছে। কোন ধরনের আইনী জটিলতায় পড়তে হচ্ছে না। অন্যদিকে একদেশ থেকে অন্য দেশে শ্রম বিনিময়কে কঠিন শর্তে বেঁধে দেয়া

হয়েছে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কিছু শ্রমিক ব্যতিত অন্য কারো পক্ষে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সুযোগ হয় না। বিশ্বায়নের ফলে আয় বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। এই বৈষম্য শুধু এক দেশের সাথে অন্য দেশের নয়, বরং একটি দেশের অভ্যন্তরেও সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বায়ন একটি শ্রেণীকেই একত্রিত ও পূর্ণতা দান করছে। কিন্তু যাদের দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব, তারা বিশ্ব বাজারের কোন সুবিধাই ভোগ করতে পারছে না। ক্রমাগত তারা প্রান্তিক অবস্থানে নেমে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছে পুঁজির ব্যবস্থাপক ও কর্পোরেট কোম্পানীগুলো। বিশ্বায়ন তাদের সামনে বাণিজ্য-সম্ভাবনার অপার দুয়ার খুলে দিয়েছে। পুঁজির প্রবাহ ও আদান প্রদানে রাষ্ট্রীয় বাধা ও আইনী জটিলতা উঠে যাওয়ার তারা বিশ্বের যে কোন বাজারে অবাধে প্রবেশ করছে। '৯০ এর দশক থেকে কর্পোরেট কোম্পানীগুলো পৃথিবীতে তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করে। পৃথিবীর খনিজ সম্পদগুলোর উপর তারা হামলে পড়ে। এ পথে যে বাধা হয়েছে তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য হত্যা, গুম ও অপহরণনের মত জঘন্য কাজ করতে কর্পোরেট কোম্পানীগুলো পিছপা হয়নি। এর শিকার, ইকুয়েডরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইমে রোল্ডাস ও পানামার সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমার জেরিহোস। তাদের দু'জন বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। দুটি বিমানেই আগুন লেগে গিয়েছিল। আসলে এটা দুর্ঘটনা ছিলো না। এটা ছিলো বহুজাতিক কোম্পানী দ্বারা সংঘটিত পরিকল্পিতি হত্যাকান্ড। তাদের দু'জনের অপরাধ ছিলো তারা নিজেদের দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর রাক্ষসী ক্ষুধা মেটাতে রাজি হননি।

হালের ইরাক ও আফগান যুদ্ধের পেছনে কারণও ছিল কর্পোরেট কোম্পানীগুলোর রাক্ষুসী ক্ষুধা। এ দুটি যুদ্ধের আড়ালে বহুজাতিকরা কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বাণিজ্য করে। যুদ্ধের ফলে দেশ দুটি পুরোপুরি ধ্বংশ হওয়ার পর আবার এই বহুজাতিকরা পুণর্গঠনের নামে এর নির্মাণ কাজগুলো হাতিয়ে নেয়। এসবই হয়েছে বিশ্বায়নের অনুকুল স্রোতে।

এ গেল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কথা, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন আরও ভয়াবহ। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর তার আপন বৈচিত্র হারাচ্ছে। দেশগুলোর নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, কালচার আজ ভয়াবহ হুমকীর সম্মুখীন। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও জাতিস্বত্তা হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপরও ইংরেজীর প্রভাব সুস্পুষ্ট। ফলে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিশ্বে আর বিকশিত হচ্ছে না। আমরা নিজেরা উত্তর-দক্ষিনের দিকে না তাকিয়ে পশ্চিমের উপর নির্ভর হওয়ায়

আমাদের মাঝে এখন মধুসূধনের মতো ব্যক্তিদের জন্ম হয় না। পশ্চিমা পপ গান, ডিসকো, কনসার্টের দাপটে গ্রামবাংলার জনপ্রিয় বিনোদনগুলো আপন আবেদন হারিয়েছে। মানুষ যেভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করছে, তাতে ভবিষ্যতে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বলে আলাদা কিছু থাকবে না। বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী আমেরিকার পণ্যায়ন, বাণিজ্য ও পুঁজির অধিপত্য প্রতিষ্ঠা। বিশ্বায়ন সাদা ও কালো দুটি রূপ নিয়ে আবির্ভূত। সাদা অবরণে বিশ্বায়ন মানুষদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখায়। তরুণ তরুণীদের আধুনিক জীবনবোধ ও 'সুখের' সাগরে ভাষায়, দিন বদলের কথা বলে কাড়ি কাড়ি টাকা আয়ের অবৈধ পথ দেখায়। এই সাদা আবরণের নেপথ্যে চলে আমেরিকার অভিলাষ পূরণ। বিশ্ববাজারে আমেরিকার পণ্যের অবাধ বিচরণ ও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব বিনাশের মাধ্যমে পৃথিবীর ভৌগলিক পরিবর্তন নিয়ে আসা।

বিশ্বায়নের ঢেউয়ে আমরা মেরুদন্ড হারিয়েছি। এখন মরে যেতে চাইনা। বিশ্বায়নের আগ্রাসন ঠেকাতে হলে মানুষকে ফিরে যেতে হবে সাড়ে তেরশ' বছর বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়া সেই বৈশ্বিক ব্যবস্থার দিকে। যা মানুষের সঠিক সমস্যা বোঝে ও তার সমাধান দেয়। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ বিশ্বকে মুক্তি দিতে পারেনি। মুক্তি আনতে হলে যেতে হবে মুক্তির পথেই।

ভোগবাদের বিশ্বায়ন ও প্রচারমাধ্যমের কৃপা

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ফলে সর্বস্তরে ভোগবাদ ঝেঁকে বসেছে। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটছে, নতুন ও পুরনো কায়দায়। এখন দেশে দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণের জন্যে আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার দরকার নেই। ঠান্ডা যুদ্ধের পর, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেবুর বিশ্বায়নের কাজ খুব দ্রুত গতিতে শুরু করে দিয়েছে। দেশে দেশে চলছে মার্কিনীদের বাজার দখলের কাজ। আর এই কাজে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সহায়ক হিসেবে, ভোগবাদী দর্শনের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমগুলো। দেশের সাধারণ মানুষ, বুর্জুয়া সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে বিভ্রান্ত হচ্ছে। চেতনা বিকাশে দিকভ্রষ্ট হচ্ছে। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উত্তরণের সঠিক পথ হারিয়ে ফেলছে । গুলিয়ে ফেলছে তাদের কর্মপন্থা।

বিশ্বায়ণের আক্রমণ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সাংস্কৃতিক জগতকেও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন দারুণভাবে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে প্রভাবিত করে দেশের বুদ্ধিজীবি মহলকে। তৈরি করে প্রতিটি দেশে তাদের পছন্দসই 'সুশীল গোষ্ঠী' এবং তাদের মুখ ঢেকে দেয় মেকি এবং অতি বামপন্থার মুখোশ দিয়ে।

উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের বাজার দখলে শীর্ষে।

এ কাজে তাদের পক্ষে জনমত তৈরির জন্য কোনো দেশের মানুষের নিজস্ব বোধবুদ্ধি, চিন্তাচেতনা বিকাশের সব দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে সেই দেশেরই বিকিয়ে যাওয়া কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কাঁধে। প্রত্যেকটি দেশে তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করার মহান দ্বায়িত্ব এই শ্রেণীটির হাতে দিয়ে সেই দেশের সম্পদ সাম্রাজ্যবাদীরা কুক্ষিগত করার চেষ্টায় আছে। তাই সব কিছু ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের বিশ্বায়নের সাথে এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আরেক অপপ্রচেষ্টা, জনমত তৈরি এবং তার প্রধান দ্বায়িত্ব নিয়েছে বাজারি কিছু সংবাদমাধ্যম। যাতে দেশ দখল করার আগে কিছু বুদ্ধিজীবিদের মস্তিষ্ক বিকৃত করা যায়। সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের এই তৎপরতাও থাকে, যেকোনোভাবে ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটিয়ে জনমত তৈরি করার। এই ফর্মূলাতে দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষদেরকে সাধারণ জণগণের বিপক্ষে দাঁড় করানো এবং নিজেদের তৈরি জনমতের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিধনযজ্ঞ চালানো।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রধান হাতিয়ার তাই শান্তিকামী গণসংগঠনগুলির বিরুদ্ধে 'ঘৃণাজর্জরিত প্রচার-অভিযান' জারি রাখা এবং এর জন্যে খোলা হয়েছে দেশী-বিদেশী প্রচারমাধ্যম, চ্যানেল, ওয়েবসাইট, ব্লগ ইত্যাদি। বিশ্বায়নের মানবিক মুখ বা Globalization with a Human Face বা Millennium Goal এর দর্শন প্রচার করতে ব্যাঙ্গের ছাতার মতন জন্ম নিচ্ছে একগুচ্ছ এনজিও। এদের কাজই হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ, বিশ্বায়নের দ্বারা শোষিত শ্রেণীর ক্রোধ প্রশমণ করা এবং আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যেকোনো বিক্ষোভ হতে এদের বিমুখ ও ভ্রান্ত করা। এরা দ্বায়িত্ব সহকারে প্রচার করে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট প্রশমন করতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রবক্তারা কতোটা উদগ্রীব। তাই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংগ্রামে গিয়ে কোনো লাভ নেই । মানুষের কষ্ট-দুঃখ লাঘব করতে পারে একমাত্র এই এনজিও গুলি। বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থা (উদাহারণ হিসেবে বিল গেটস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট) তাদের শোষিত লাভ্যাংশের একটি ছোট অংশ এই এনজিও মারফত খরচা করে প্রমাণ করতে চায় যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ত্বত্ত্ব কতটা মহার্ঘ এবং তাদের সৃষ্ট প্রচারমাধ্যম কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ।
শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কেউ শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। এই নিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে 'স্বাধীন' প্রচারমাধ্যমের সাথে এনজিও গুলি অন্তরিক্ষে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে এবং প্রভুত সম্পত্তি লুন্ঠন করছে । শ্রমজীবি মানুষকে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে বিমূখ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই 'স্বাধীন' ও 'নিরপেক্ষ' প্রচারমাধ্যমের আরেকটি কাজ হলো, বিভিন্ন

দেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যাবস্থায় নাক গলানো।
সাম্রাজ্যবাদের নাক অনেক লম্বা। তাদের নাক গলানোতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দালালি করছে প্রচারমাধ্যমগুলো। বর্তমানে ইরানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারকে বেআইনি সাব্যস্ত করতে প্রচারমাধ্যম উঠে পড়ে লেগেছে। তাই আমরা দেখি,অনেক পোশাকি নাম দিয়ে বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশে দেশে মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় রাখাই এই প্রচারমাধ্যমের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আমাদের দেশে বা পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মদদে প্রচারমাধ্যমে যেসব ইসলামবিরোধী প্রোপাগাণ্ডা চলছে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এসব দেখে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। কারণ এটা নতুন না, সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরনো খেলা। ইতিহাসের পাতায় প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যুগে যুগে দখলদারি, মুসলমানদের হত্যা ও নির্মূল করার প্রতিটি ষড়যন্ত্রে আগ্রাসীদেরকে সহায়তা করেছে প্রচারমাধ্যমগুলো। এই উপমহাদেশের কথাই ধরা যাক, ব্রিটিশরা এদেশে এলো, শাসক হিসেবেই এলো, এবং এদেশের শত শত বছরের মুসলিম সালতানাতকে কুক্ষিগত করলো,তাদের পুরনো দানবীয় চেহারায় আবির্ভূত হয়ে। এই দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ সংগ্রমে অবতীর্ণ হলো, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো সন্ত্রসী, গাছে ঝুলিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো তাদের, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো, মসজিদকে আস্তাবল বানানো হলো, মাদরাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হলো,আর এ কাজে ভালোভাবেই সহয়োগিতা করলো প্রচারমাধ্যম। প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে তাদের নিষ্ঠুরতা আড়ালে পড়ে গেলো, বিশ্ববাসী জানলো দখলদার ব্রিটিশরা কোনো সংগ্রমীকে শয়েস্তা করছেনা, শায়েস্তা করছে কতিপয় উশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে। ফলে তাদের হত্যা ও দখলদারিত্ব জায়েজ হয়ে গেলো, এর বিরুদ্ধে কোনো জনমত তৈরি হলো না। এই সুযোগে দখলদারেরা ইচ্ছেমতো লুণ্ঠন করলো এদেশের সম্পদ, দুইশ' বছরের অপশাসনে পিষ্ট হলো এদেশের মানুষ।
আফগান-ইরাকের কথাই ধরা যাক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার তেল-গ্যাসের। কী করে পাওয়া যাবে এটা? হ্যাঁ, পাওয়ার সহজ উপায় আছে একটা, সেটা হচ্ছে দখল। তাই সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরনো খেলা দেখি আমরা আফগান-ইরাকে। রূপ বদলে নয়, সরাসরি দখলদারের মুখোশ পরে, সেই সাম্রাজ্যবাদী চেহারায়। বাজার নয়, সরাসরি ভূমি দখল। ইরাকে তেল আছে, আফগানে আছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। সাম্রাজ্যবাদী কুকুরের হা করা মুখ তাই সে দিকে অগ্রসর হলো। অজুহাত একটা তৈরি করতে হয়, কী সেই অজুহাত? অজুহাত হলো, আফগানে বিন লাদেন লুকিয়ে, সে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য

হুমকি, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে ধরতে হবে। অতএব চালাও আক্রমণ, জ্বালাও আফগানীদের, ধরো লাদেনকে।
ইরাকের জন্যও তৈরি হলো অজুহাত। কী সেই অজুহাত? অজুহাত, সাদ্দামের কাছে মারণাস্ত্র আছে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটা হুমকি। তাই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এটা উদ্ধার করতে হবে। কী করে করা যাবে উদ্ধার? করা যাবে আক্রমণ করে। অতএব করো আক্রমণ, পোড়াও ইরাক।
পুড়লো দু'টি দেশই, কিন্তু আফগানে বিন লাদেনকে পাওয়া গেলো না, ইরাকে পাওয়া গেলো না মারণাস্ত্র। তবে কী বলা যাবে এখন বিশ্ববাসীকে? জর্জ বুশ সাংবাদিকদের বললো, মারণাস্ত্র পাওয়া না গেলে কী হবে, সাদ্দামকে উৎখাত না করলে মারণাস্ত্র বানিয়ে ফেলতেও পারতো। আর লাদেন? লাদেন লুকিয়েছে পাকিস্তানে। তাই পাকিস্তানের দিকে এগোতে হবে এবার।
মারণাস্ত্র, বিন লাদেন কিংবা ক্রুসেড যা-ই বলা হোক, সবই অজুহাত। উদ্দেশ্য তেল-গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন। তাই দেখি আজ ইরাক-আফগান নিঃস্বকরণ চলছে। কিন্তু এই পাপাচারকে ঢেকে রাখছে সাম্রাজ্যবাদীদের মমদপুষ্ট প্রচারমাধ্যমগুলো। তারা প্রচার করছে, আমেরিকা এখানে দখলদারি নয়, 'সন্ত্রাস' দমন করছে। তারপরও বিশ্বব্যাপী সাম্যাজ্যবাদের এই কুটিল ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। বিবেকবান মানুষেরা জেগে উঠছে। আশার কথা এখানেই।

পুজিবাদী বিশ্বায়ন বা সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর মূল দর্শন হলো মুনাফা, আরো লাভ। সেই লাভ করার বিজয়রথ তাদের চালিয়ে যেতেই হবে। যে করেই হোক। যেকোনো দেশের শ্রমজীবি, মজুর শ্রেণী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে সব চেয়ে বেশি নিষ্পেষিত, মারাত্মক রকম শোষিত। কিন্তু সেই লাভের ফানুস ফোলাবার জন্যে দরকার এই নীচু শ্রেণীর মানুষের ওপর আরো নীপিড়ন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই মূল দর্শনকে প্রচার করার জন্যে দরকার তাই নানান সংবাদমাধ্যম, প্রচার, প্রীন্ট মিডিয়া, দূরদর্শন, ইন্টারনেট, ব্লগ ইত্যাদি। উৎপাদন উপায়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো হয়, সাথে ঘটানো হয় তথ্য-প্রযুক্তিতে 'ধ্বংসাত্মক' অগ্রগতি। ধ্বংসাত্মক কেন? কারণ এই তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটানো হয়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরে অবস্থিত সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এই অগ্রগতি সৃজনশীল কখনই নয়। কারণ তা ব্যবহৃত হয় আরো তীব্র শোষণের তাগিদে। সোজা কথায় মুনাফার তাগিদে। এই মুনাফার করার রথ স্তব্ধ হয়ে গেলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে তার মালিকবৃন্দের পতন ও ধ্বংস অবধারিত। এই তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটাতে গিয়ে এবং ঘটাবার পরে, চলে প্রকৃতি যার এক অংশ মানুষ, তার ওপর চলে নির্মম শোষণ। প্রাকৃতিক

সম্পদগুলিকে নির্দয়ভাবে নিংড়ে নিয়ে তাকে পরিবর্তন করা হয় ডলারে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা ব্যবস্থা নানা দিক দিয়ে সঙ্কটে পড়ে এই ভারসাম্যহীন শোষণের ফলে । প্রাকৃতিক নিয়ম গুলি বিগড়ে যায়। আসে মারাত্মক রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মুল দর্শন মুনাফা এবং আরো মুনাফাকে সুনিশ্চিত করার জন্যে অবলম্বন করা হয় উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্য। 'উন্নত' ও শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা যে কোনো দেশের সীমানা মানে না, লগ্নি পুঁজির অবাধ চলাচলের সাথে এই প্রচারমাধ্যমের অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অবাধ চলাচলের তাই দরকার হয়ে পড়ে, তা সে ছাপানো নিউজ প্রিন্ট হোক বা ইন্টারনেট, ব্লগ কিংবা টিভি চ্যানেলে। এই মাধ্যমগুলির ঘাড়ে দেয়া থাকে সবরকমই গুরুদায়িত্ব। তা সে যেকোনো রাজনৈতিক বিষয়ে ওপিনিয়ন তৈরি করে মানুষের সামনে পরিবেশন করা অথবা নানান বস্তুসামগ্রী বিপননের তাগিদে বিজ্ঞাপন (কুরুচিপূর্ণ হলে আরো ভালো, চিন্তা নেই তার জন্যে মুখ খুলে বসে আছে সহায়ক বহুজাতিক কোম্পানীগুলো) এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভোগবাদের মোহ সৃষ্টি করা অথবা চরম কুরুচিকর, হিংস্র বা ইতিহাস বিকৃত করে সাম্রাজ্যবাদী (মার্কিন দেবদূতদের মতো) আমেরিকার প্রয়াসে 'শয়তান' তালেবান নিধনের গল্পাকারে চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মনের সুন্দর প্রাকৃতিক গঠনকে সমূলে ধ্বংস করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করা। নব্য-গোয়েবেলসীয় কায়দায় মানুষের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, চিন্তায়, মননে তখন গেঁথে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চলে যে 'শয়তান' রাষ্ট্র বা তালেবানকে দমন করার জন্যে এবং সারা বিশ্বে 'গণতন্ত্র' বিস্তারের জন্যে মার্কিন দেবদূতরা সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছেন। কিন্তু তার ফলে সমাজের সর্বস্তরে ছেয়ে ফেলে জঘন্য দুর্নীতি, অনায়াসে খুনোখুনি, যৌনতা ইত্যাদি মানুষের অন্ধকারতম পাপাচারগুলি।

ইদানীং কালে এই সব বিজ্ঞাপনে দেখা যায় এক অদ্ভুত বিভেদাকার বা সমাজ জীবনে নিজেদের মধ্যে হিংস্র, স্বার্থপরতা অবলম্বন করার জন্যে দ্যর্থহীন আবেদন। আগে যেমন বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখা যেত সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী যেমন লন্ঠন, ঝাড়ু, লুংগি, গেঞ্জী, আজকাল অবশ্য বিজ্ঞাপনী মানসিকতা গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রী পরিত্যাগ করেছে। এখন টিভি কিনতে হবে। গাড়ি, দামী আসবাব, দামি মোবাইল দামি পোশাক-আশাক আর কতো কী। একটা গাড়ির বিজ্ঞাপন দেখা গেলো, গাড়িটি আস্তেআস্তে এলো, হোটেলের সামনে দাঁড়ানো বেয়ারকে হেট হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যেন সাধারণ এক নির্জীব বস্তু হয়েও গাড়িটি তার প্রভু বা

মালিক। এই হচ্ছে বহুজাতিক ভোগবাদী মানসিকতার নিদর্শন। অঙ্কুরেই বিষ ঢোকানো হচ্ছে। সাথে আছে নারীদেহ প্রদর্শনের এক দূর্নিবার প্রতিযোগিতা। অর্থের লোলুপতা মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, এটা উলঙ্গভাবে প্রকাশ পায় পুঁজিবাদের আচার-আচরণে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবাহমানতার সাথে একনিষ্ঠ হয়ে চলে যৌনব্যবসা। চলে নারী জাতির অসম্মান। গরিব মানুষের সীমাবদ্ধতার, দৈনন্দিন জীবনযাপনের যন্ত্রণার তাৎক্ষণিক ওষুধ। তাকে দেহ ব্যাবসায় নামানো। এই অবৈধ ব্যাবসার চিত্রগুলি রূপে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার এটাও শোনা যায় যে এইসব ওয়েবসাইটগুলি সদর্পে দিনে-দুপুরে দেহ ব্যাবসার দালালচক্র হয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সীমাহীন অর্থলোলুপতা মানুষের মূল্যবোধকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আজকাল টিভি অনুষ্ঠানগুলোতে আর গরিব পরিবারের জীবনযাপনের কাহিনী পাওয়া যায় না। উঠে আসে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনাচার। সবাইকে, এমনকি নিম্নশ্রেণীর মানুষকেও মোহে আটকে রাখা হয়। সবই এই প্রচারমাধ্যমের কৃপা। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এই মুনাফালোলুপতা বা অর্থলোলুপতা এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করে দেশে দেশে আরো চাপ সৃষ্টি করছে তাদের পণ্যের চাহিদা এবং বিক্রয়কে আরো সুনির্দিষ্ট করার জন্যে । এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা রাষ্ট্রসমূহের ভ্রান্তনীতির এবং রাষ্ট্রের আর্থনৈতিক শক্তির অপব্যবহারকারী প্রচন্ড প্রতাপশালী সংবাদমাধ্যমগুলির । রাষ্ট্রের যুবসমাজ বা ছাত্রসমাজের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে দামি দামি বৈদ্যুতিক গেজেট সামগ্রী। আই-পড, আই ফোন, ল্যাপ্টপ, এল-সিডি ইত্যাদি। এই প্রলোভনের ফাঁদে ধরা পড়ে ছাত্র, বেকারসহ চাকরীরত মধ্যবিত্ত মানুষ ও শ্রমজীবি শ্রেণী। ডলার বা টাকা না থাকলে ক্ষতি কী? বহুজাতিক কোম্পানী তো আছেই ক্রেডিট কার্ডের পরিবেষণের জন্যে। কিনুন, আরো কিনুন। লোভ তো থাকবেই। এখন ভোগ করা যাবে না তো কবে? অর্থ শোধ দেবার ক্ষমতা না থাকলে সেই অর্থ পরিষোধের জন্যে আরো ক্রেডিট কার্ডের ব্যাবস্থা করা যাবে। এই ভাবে কারো কারো কাছে ১০ থেকে ১২ টা ক্রেডিট কার্ড জমে যায়। একটা শোধ না করতে পারলে আরও একটা । এইভাবে সর্বসাধারণকে দেনার দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। আর যাদের ঋণ দেবার ক্ষমতা আছে, তাদের কাছ থেকে নানান ছল-চাতুরি এবং শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে, এগ্রিমেন্টের অর্থের থেকে দ্বিগূণ বা তিনগুণ পরিমাণ নিয়ে নেয়া হচ্ছে। মানুষের বহু কষ্টার্জিত সঞ্চয় রাতারাতি মানুষের অজান্তে তার কাছ থেকে আত্মসাৎ করে নিয়ে যাচ্ছে। এই হলো বহুজাতিক ভোগবাদের মহার্ঘতা। বহুজাতিক ভোগবাদ থেকে জন্ম নেয় স্বার্থান্ধতা ও আত্মসর্বস্বতা। মানুষ হারিয়ে ফেলে যুগ যুগ ধরে

সঞ্চিত মানবিক মূল্যবোধ এবং মানব সমসষ্টিকে আরো অর্থলোলুপ করে দিচ্ছে, করে দিচ্ছে আরো অমানুবিক, পাশবিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং তার সাথে ভোগবাদ প্রযুক্তির এই অসাধারণ প্রগতির যুগে টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যমে যে সংস্কৃতি প্রচার করা হচ্ছে তা হচ্ছে এক অর্থলোভী স্বার্থসর্বস্ব ও যৌনতা সর্বস্ব সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি মানুষকে তার পরিবার, সমাজ বহির্ভূত জীবে রূপান্তর করে দিচ্ছে। তার ভোগ-লালসা মেটাবার জন্যে মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। তার চাকরি ক্ষেত্রে এবং বহু বিপিও গুলিতে তাকে মগজধোলাই হয়, যে সে একজন সমাজের এলিট শ্রেণী তে পড়ে, তাই সে সমাজকে ভিন্ন হিসেবে, নিজের থেকে আলাদা হিসেবে দেখতে শেখে।

পুজিবাদী ভোগবাদী দর্শনের পরিণাম খুন, জখম, যত্রতত্র বলাৎকার, সব কিছুর পন্যায়ণ ইত্যাদি । এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতি মানবজাতির প্রগতির পথে, জীবনের প্রকৃতিক সুস্থ্য সবল সংগ্রামের পথে দারূণ বাঁধা সৃষ্টি করে। তাই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াই কেবলমাত্র আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, এই সংগ্রামকে বিকশিত করতে হয়। তাই সাংস্কৃতিক স্তরেও, যাতে প্রকৃতির নিয়মে তৈরি হওয়া সমাজের যা কিছু সুন্দর, সুস্থ্য, স্বাভাবিক এবং মানবিকতা যাতে ধ্বংস না হয়ে যায়। এই সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে বিকশিত করতে হবে নানান গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, ছাত্র ও যুবসমাজকে এবং শ্রমজীবি শ্রেনীকে সংগঠিত করে, যাতে একটি সুন্দর , হিংসাহীন, আপসহীন সমাজ নির্মাণ করা যায়। তাই নতুন সমাজব্যবস্থা তৈরির দ্বায়িত্ব সাধারণ মানুষকেই নিতে হবে এবং ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে বর্তমান সমাজে মানুষের এই চেতনার বিকাশ ঘটানোর দ্বায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক স্তরে এই সুন্দর, নির্মল এবং হিংসাহীন সমাজ ব্যাবস্থা গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে নীতি আদর্শে সংগঠিত করার দ্বায়িত্ব যুবসমাজকেই নিতে হবে।

বিশ্বায়ন : স্বকীয় সংস্কৃতিতে বিপর্যয়ের পদধ্বনি

ক'দিন ধরেই সালেহ স্যার আমাকে খুঁজছিলেন। পেয়েই বললেন, বিশ্বায়নের খোঁজ-খবর রাখো? আমাদের সংস্কৃতির ওপর যে দানব বিশ্বায়নের একটা প্রভাব পড়ে যাচ্ছে দিনদিন– লক্ষ করেছ? বললাম, এ সম্পর্কে আবছা আবছা একটা ধারণা আছে, আপনি বুঝিয়ে বললে পুরোপুরি জানতে পারবো। স্যার বললেন, বিশ্বায়ন একালে অতি পরিচিত একটা শব্দ আমাদের কাছে। ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসি প্রভৃতি শব্দ ও মতবাদ যেরকম পশ্চিমাদের নিকট থেকে আমদানী হয়েছিল এবং উপনিবেশিকতার বদৌলতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, এ শব্দটিকেও এখন আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলেও মূলত এটা আমাদের কাছে এসেছে পশ্চিমা দেশ, দাতাসংস্থা, পশ্চিমা পন্ডিত ও প্রচারমাধ্যমের প্রচেষ্টায়। পরে এদেশীয় পশ্চিমা-ঘেষা বুদ্ধিজীবী মহল এর ব্যাপক বাজারজাত করা শুরু করে। তার প্রচার-প্রসার ও চর্চার মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক যে গতিপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এ শব্দটি আমাদের কাছে আসুক না কেন, এটি যে একটি আরোপিত বিষয়, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বকীয় মূল্যবোধের সঙ্গে বেখাপ্পা এবং এর অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া যে চরম প্রতারণামূলক, তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

এটি আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও আসলে এর পটভূমি ও বিকাশের ইতিহাস অনেক পুরনো। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ স্বতন্ত্র বিশ্ববাদ সভ্যতা রূপে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তৎপর হয়, পৃথিবীর দখল ও নেতৃত্বের প্রশ্নটা যখন পুনরায় সামনে চলে আসে তখন সমাজতন্ত্রের

অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব দানবীয় চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। মূলত পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকেই বিশ্বায়নের আবির্ভাব ধরা যায়। এর সঙ্গে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববাদ নিবিড়ভাবে জড়িত। স্বঘোষিত বিভিন্ন শ্লোগান এক্ষেত্রে তাদের চলার পথকে সুগম করে তোলে। 'আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক– এসব উক্তি পশ্চিমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। যা খ্রিষ্টীয় বিধানের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে দখলদারিত্ব কায়েম করা ও পরজাতি নিধর্নের ব্যাপারেটিকেই প্রস্ফূটিত করে তোলে।

পুঁজিবাদের নতুন মুখোশ হিসেবে বিশ্বায়নের আবির্ভাব। মুখোশের অন্তরালে মুখ লুকিয়ে চলাফেরা করছে সে। পুঁজিবাদের সুবিধার্থে একটা সুশীল চেহারা দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে। পুঁজিবাদের কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে বাজার খোঁজা আর এই কাজের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তিরও প্রয়োজন। যেহেতু পুঁজিবাদ সম্রাজ্যবাদের সহোদর, একটি ছাড়া আরেকটি বাঁচার কল্পনা করা যায় না, তাই পশ্চিমাবিশ্ব এতদিন এ কাজটাই করে আসছিল, এখন বিশ্বায়নকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

'আমরা সবাই এক বিশ্বের অংশ, এখানে কোন বৈষম্য থাকবে না'–এসব বাণীকে পুঁজি করে তার বাজারজাত করা হচ্ছে জোরেশোরে। এজন্য পশ্চিমারা আগের মত উপনিবেশিকতাকে বৈধতা না দিয়ে ফ্রিডম, ডেমোক্রেসি, মানবাধিকার আর সিভিল সোসাইটির কথা বলে। একালে সাম্রাজ্যবাদীদের জবরদস্তির ধরণও তাই অন্য রকম। মিডিয়া, বিজ্ঞাপন আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে তারা কাজের গতি পাল্টে দিচ্ছে। তাই বিশ্বায়ন কাজ করছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মতো লুণ্ঠনকারী সংস্থার সহায়তায়। আর জাতিসংঘ তো সাথে আছেই। দেশে দেশে তাই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের দোকান এজেন্সী তৈরী হয়েছে। এরাই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

বিশ্বায়নের ধারণাটি মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বেড়ে উঠলেও বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানেও এর প্রভাব এখন মোটেও উপেক্ষার বিষয় নয়। বিশ্বায়নকে বৈশ্বিক বলা হলেও বাস্তবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নিজ নিজ দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। The myth of the global corporation নামক বইয়ে পল ডরমাস ও তার সহকর্মীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমেরিকান, জার্মান ও জাপানি বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের বিশ্লেষকরা সাধারণত বিশ্বায়নকে অর্থনৈতিক ধারণার সাথে

সম্পৃক্ত করে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তারা রাজনীতি, ইতিহাস, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক কিংবা সমাজের সাথে বিশ্বায়নের সম্পর্ককে তুলে ধরেন না। কাজেই বিশ্বায়নকে দেখতে হবে আধুনিক পুঁজিবাদের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে, তা না হলে এ সংক্রান্ত যেকোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

বিশ্বায়নের মুখরোচক শ্লোগান 'এক গ্রামের মত বিশ্ব' ভাবনা ভিন্ন দৃষ্টি ও ভিন্ন চিন্তা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। এ থেকে বুঝা যায়, বিশ্বের কোন এক অংশে সংঘটিত পরিবর্তন বা উন্নয়নের প্রভাব পৃথিবীর অন্য অংশে পড়তেও বাধ্য। সাথে সাথে বলা হয়, সকল মানুষের হাতের মুঠোয় থাকবে পৃথিবী, তাহলে তো সকল মানুষের অধিকারও সমান থাকার কথা। কেউ এখানে মোড়ল বা প্রভু থাকার কথা নয়। অথচ, বাস্তবতা হলো, বিশ্বায়নের কারণে আয়-বৈষম্য দিনদিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আরো বলা হয়, বিশ্বায়নের দুটি রূপ একটি 'প্রযুক্তি' অপরটি 'অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী', প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ধনী রাষ্ট্র বিশেষ করে আমেরিকা-ব্রিটেনের জনগণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, সে তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের জনগণ কি সামান্য কিছুও পাচ্ছে? তাহলে 'এক গ্রামের মতো বিশ্ব'– কথার তাৎপর্য কী? বিশ্বায়নের প্রবক্তারা কি আমাকে বিনা পাসপোর্টে আমার 'গ্রাম' ঘুরে দেখতে দেবেন? যদি না দেন, তবে বিশ্বায়ন কার স্বার্থ রক্ষা করে? সহজ কথায় ধনীদের। গরীবদের সামনে শুধু মুলোই ঝুলবে, সুফল পাবে ধনীরা। তারা বিনা শুল্কে পণ্য রপ্তানি করবে, পুঁজিবাদী শরীরটা দিনদিন মোটা করবে আর গরীব রাষ্ট্রগুলো দিনদিন ফুটা হবে–এই হলো 'এক গ্রামের মতো' শ্লোগনের তাৎপর্য!

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দরিদ্র দেশের জনগণ অতিরিক্ত গ্যাস বিল বা বিদ্যুৎ বিল প্রদান করবে কিনা সেটা নির্ধারণ করার এখতিয়ার সে সব দেশের সরকারের নেই। এটা নির্ধারণ করছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি পুঁজিবাদের ধারক বাহক সংস্থা। দরিদ্র দেশের এই চরম নির্ভরশীলতা আমাদেরকে এক নব উপনিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উপর্যুক্ত দুটি রূপের (প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি) আলোকে দেখা যায়, প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সুবাধে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে বিশ্বের নানা দেশে বহুজাতিক কোম্পানী, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে। কাজেই বিশ্বায়ন আদিপত্যবাদী ব্যবস্থায় বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের একটি তত্ত্ব মাত্র। তাকে দুর্বৃত্তায়ন বলাই শ্রেয়।

আমাদের সামনে বিশ্বায়ন বলতে বিভিন্ন দেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রের একত্রিত হওয়ার তীব্র প্রবণতাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

অন্য অর্থে বিশ্বায়ন এমন এক বিশ্বের ধারণাকে তুলে ধরে, সেখানে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সীমান্ত বা জাতীয় সীমারেখার কোন ভূমিকা থাকবেনা। এজন্য বিশ্বায়নের মাধ্যমে দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবন-যাপন দর্শনসহ সবক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো।
বিশ্বায়নের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা পৃথিবীর অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনছে। নিজেরা ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে। আর যে সমস্ত রাষ্ট্রকে তাদের অর্থনীতি-রাজনীতির জন্য হুমকি মনে করছে, একের পর এক তাদের নিশ্চিহ্ন করছে। যার প্রমাণ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটে যাওয়া মানব ইতিহাসের কলংকজনক দুটি অধ্যায় আফগান ও ইরাক যুদ্ধ। আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণের মূল কারণ ছিল সে দেশের উপর দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক জটিলতা নিরসন করা। এছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ পর্যন্ত ৪০টি দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করেছে এবং স্বৈরাচারী এক নায়কবিরোধী ৩০ টিরও বেশি গণআন্দোলনকে বলপ্রয়োগ করে দমন করতে সাহায্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত কত শত হাজার কোটি ডলার খরচ করেছে, বিনষ্ট করেছে মানুষ হত্যার জন্য সে হিসেব শুনলে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হিরোশিমায় ৭০ হাজার এবং নাগাসাকীতে ৫০ হাজার মানুষ হত্যা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, হাইতি, থাইল্যান্ড, ঘানা, চিলিসহ বহুদেশেই মানুষ হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে দেশে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্য করছে। তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে চলছে সমাজের গভীর থেকে গভীরে। বিলাসদ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য থেকে নিয়ে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর সরবরাহ করছে। ভোগের চাহিদা তৈরী করছে। ফলে গরীব দেশের তরুণ-তরুণীরা নানা রকম অনুৎপাদনশীল কাজে লিপ্ত হয়ে করছে অন্ধ পশ্চিমা অনুকরণ। তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ভোগের চাহিদা। আর কোনো সমাজে ভোগের চাহিদা তৈরী করা মানে ভোগের সংস্কৃতি তৈরী করা। ফলত : বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এটা করে যাচ্ছে। এরা অবাধ বিনিয়োগের কথা বললেও নিজেরা কিন্তু সংস্কৃতি বিহীন নয়। তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করে ঠিকই। সেটা হলো ভোগবাদী মানসিকতায় মানুষকে লিপ্ত রাখা। যেটা তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যে কারণে দেখা যায়, আজকের বিশ্বায়িত প্রজন্মের সামনে জাতীয় সংস্কৃতির চেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে টাটকা ফ্যাশন, ভেলেন্টাইস ডে, সুন্দরী প্রতিযোগিতার মত বিষয়গুলো। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পালিত হচ্ছে বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, ক্রিসমাস ডে, থার্টিফার্স্ট নাইট। ফলে এখন ঈদের দিনে মুসলমানরা অন্য বাড়িতে বেড়াতে গেলে কেক ও ফুল নিয়ে হাজির হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের নিজস্ব ও লোকজ সংস্কৃতিও বিশ্বায়নের প্রভাবে আজকের পয়লা বৈশাখ, বাসন্তী উৎসবের মতো ব্যাপারগুলো তাদের সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধনে বড় বেশি ভূমিকা রাখছে। এগুলোকে প্রমোট করছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো।

আদর্শিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব হলো অবাধ, অবারিত প্রযুক্তির সুযোগে মানুষের ঘরে ঘরে লাম্পট্য, অশ্লীলতার বীজ ছড়িয়ে দেয়া। মানুষের ভেতর সুড়সুড়িও আত্মরতির জগত তৈরী করা। ফলে পর্ণো, যৌনতা, বেশ্যাবৃত্তি আজ ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মাদক ব্যবসার পাশাপাশি বিনোদন তথা যৌনব্যবসায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে এবং তার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র ও বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে গরীব দেশগুলো।

বিশ্বায়ন আমাদের জন্য ভোগের উপাদান ও প্রয়োজন তৈরী করছে। আর ভোগের প্রয়োজনকে বহুজাতিক কোম্পানী গণমাধ্যমে ও তাদের বিজ্ঞাপনী সংস্থার এজেন্টদের মাধ্যমে তৈরী করাচ্ছে। যাতে সেভাবে পণ্যের বাজারজাত করা যায়। যে কারণে খানাপিনা থেকে পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকালে দেখা যাবে মুসলিমবিশ্বই হলো পশ্চিমা নানা রকম বিলাসপণ্যের ক্রেতা ও মূল গ্রাহক। মুসলমানরা তাদের উৎপাদিত নানা রকম বিলাসসামগ্রী কেনে। যেগুলো তাদের মূল্যবোধ ও ঈমান-ইসলামের চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ ভোগবাদী মানসিকতার কারণে যে ইমেজ তৈরি হয়, তার কাছে জাতীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে আমাদের কামনা-বাসনার জগতে ঢুকে পড়া বিশ্বায়নকে আজ শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে বুঝলে চলবেনা। এটি যে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকেও উন্মুল করে দিচ্ছে তারও কিছু আমাদের আঁচ করা দরকার।

ভারতের বিশিষ্ট লেখক ইয়াসীর নাদীম ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের কারণ উল্লেখ করে তাঁর 'গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম' বইয়ে লিখেছেন– 'খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার দি গ্রেট প্রাচ্য বিজয় করে তার সকল পন্ডিতদেরকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যে, তারা প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করবে এবং তার দুর্বলতা সমূহকে চিহ্নিত করবে, যাতে এই গবেষণার আলোকে প্রাচ্যকে গোলাম বানানো যায়। সেই থেকে গীর্জাগুলো প্রাচ্যের

বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে। কিন্তু ইসলাম যখন জাজীরাতুল আরবের সীমারেখা অতিক্রম করে দিনে দিনে তার দাওয়াত পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে লাগলো, তখন পশ্চিমা দুনিয়ার গীর্জার পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল। ইসলামকে পরাজিত করা এবং তাকে ফোকলা করার জন্য নানা পরিকল্পনা হতে লাগলো।

পরিশেষে তাদের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা, মস্তিস্কে চেপে থাকা অহংকার-অহমিকার উত্তাল ঢেউ ক্রুসেড যুদ্ধ রূপে উপচে পড়ে। কিন্তু তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর পশ্চিমা জগত যুদ্ধের ধরণ ও কৌশল পাল্টে দেয়। তৈরী করে নতুন কর্মকৌশল। পশ্চিমা দুনিয়া তার নাম দেয়, ইস্তেশরাক (ওরিয়েন্টালিজম) বা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা।'

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা বিশ্বায়নের সূত্রপাতের খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। সাথে সাথে পশ্চিমা দুনিয়ার তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত স্যামুয়েল পিটার হান্টিংটন'র বক্তব্য এ বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে তোলে। তিনি বলেন, যেহেতু সমাজতন্ত্র-উত্তর দুনিয়ায় নতুন কোন মতাদর্শ নেই, তাই বিভিন্ন সভ্যতা এখন পারস্পরিক সংঘাতের ভেতর দিয়ে এগোবে এবং খ্রিষ্টাবাদ, ইসলাম এবং চৈনিক সভ্যতার মধ্যে লড়াই হবে। তিনি বিশেষ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য ইসলামকে শক্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যা কিনা মতাদর্শিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতাকে মোকাবেলা করার সামর্থ রাখে। অন্যদিকে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা সমাজতন্ত্র-উত্তর পরিস্থিতিকে দেখেছেন ইতিহাসের সমাপ্তি হিসেবে। তার মতে পশ্চিমাদের হাতেই ইতিহাসের গতি চলে গেছে এবং সেই গতির সামনে দাঁড়ানোর কেউ নেই। এসব পণ্ডিতের মতামতকে সামনে রেখে বিশ্বায়নের অতীত ঘাঁটতে গেলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক সময়ের কর্পোরেট কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন অতীতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাজ ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সব কিছুতে সবসময়ই ধনতন্ত্রী অর্থনীতি বা কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে। রাষ্ট্র যেভাবে অতীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা করেছে, বর্তমানেও বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। এসকল বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থে বিভিন্ন দেশে মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ইউএনডিপির হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে এখন সামরিক খাতে যে ব্যয় হয় তা পুরো বিশ্বের ৩০ কোটি মানুষের আয়ের সমান। পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের যে কারণ আমরা দেখি,তার কারণও এটা। সমরাস্ত্র কেন্দ্রীক ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, প্যান্টাগন পৃথিবীব্যাপী উত্তেজনা তৈরী করতে সিআইয়ে এবং বিভিন্ন দালাল গোষ্ঠীর মাধ্যমে ইন্ধন তৎপরতা যুগিয়েছিল।

আনু মুহাম্মদ তাঁর 'বিশ্বায়নের বৈপরীত্ব' বইয়ে উল্লেখ করেন, 'পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ১০০টি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টি হচ্ছে কর্পোরেট আর ৪৯টি রাষ্ট্র। বিশ্বে কম্পিউটার উৎপাদনের ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ১০০টি সংস্থা। কীট নাশক ওষুধের ক্ষেত্রে ১০০টি সংস্থা শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করে। টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ৮৬ ভাগ নিয়ন্ত্রণ মাত্র ১০টি সংস্থার হাতে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের কয়েকশ' সংস্থাই শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ সম্পদ উৎপাদন এবং পুঁজি বিনিয়োগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে আছে।'

এ সকল কোম্পানী বিভিন্ন দেশে মানব উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক দল সমূহকে মোটা অংকের চাঁদাও দিয়ে থাকে। দরিদ্র বিমোচনে কিছু ভূমিকা রেখে সামাজিক অবস্থানও রচনা করে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, স্বদেশের বাজারে ধুমধামে বিদেশী পণ্য বিক্রি হচ্ছে আর স্থানীয় উৎপাদন পিছিয়ে যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। স্বদেশের কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা পণ্য মার্কেট পেলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও টিকে থাকার ক্ষমতা রাখতো, কিন্তু সেগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মার খাচ্ছে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর মানব উন্নয়ন দলীলে বলা হয়েছে, বিশ্বায়নের ফলে সবচাইতে বেশি লাভবান হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্তরা। ৬টি আন্তর্জাতিক বৃহৎ সংস্থা বছরে দেড় ট্রিলিয়ন ডলার বা ৭৫ লক্ষ কোটি টাকা মাদকদ্রব্য, যৌনবাণিজ্য, সমরাস্ত্র ইত্যাদি থেকে লাভ করে। এছাড়া বিশ্বায়নের ফলে যা হচ্ছে তা মূলত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে সম্পদের জন্য, অস্ত্রের জন্য, অর্থের জন্য ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় মাতিয়ে রেখে মানুষের মাঝে, দেশের মাঝে বিভেদ তৈরী হচ্ছে, সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে আর বিনষ্ট হচ্ছে বিশ্বের শান্তি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

বিশ্বায়নের অব্যাহত প্রভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে আগ্রাসনের কবলে মুসলিম জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুলভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং একটি ইসলাম বিরোধী মিথ ও ডিসকোর্স গড়ে তোলা হয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় বোধে কোন স্বাতন্ত্র থাকেনা। ফলে মুসলিম মানসে আত্মপরিচয়ের সংকট মহামারির মতো ছড়িয়ে গেছে। এমনকি বিশ্বব্যাপি ইসলামকে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, সন্ত্রাস ইত্যাদি বিতর্কিত ইস্যুর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এ কাজটি একদিনে হয়নি। দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রুসেড, উপনিবেশিকতা ও আজকের বিশ্বায়নের ভেতর দিয়ে এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিশ্বায়ন প্রতিষ্ঠিত। কাজেই

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-চেতনায় ইসলামী চেতনা উপক্ষিত থাকবেই।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাই মুসলিম সমাজকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে এক লড়াকু প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তার সাংস্কৃতিক নিরুদ্দেশহীনতা কাটবেনা। এজন্য বিশ্বায়নের এই সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হলে চাই আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচেষ্টা। সর্বোপরি এক বৈশ্বিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সব মানুষকে একত্রিত করে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হতে হবে। আর সেই বৈশ্বিক মতাদর্শ হলো ইসলাম, ইসলাম এবং ইসলাম। কেবলই ইসলাম।

সন্ত্রাসবাদের সত্য-মিথ্যা

ক্ষুদিরাম বসুর আত্মত্যাগ ব্রিটিশ ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে প্রবল গতি সঞ্চার করেছিলো। কলকাতার অত্যাচারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে বোমা নিয়ে রাস্তার ধারে দাড়িয়েছিলেন তিনি। কিংসফোর্ড যে গাড়িতে থাকার কথা ছিলো, বোমা নিক্ষেপ করেন সেই গাড়িতে। কিন্তু কিংসফোর্ড বেঁচে যায় অন্য গাড়িতে থাকার কারণে। মারা পড়েন দু'জন ইংরেজ মহিলা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং ইংরেজের বিচারে তার ফাঁসি হয়। সেটা ১৯০৮ সালের কথা।

স্বদেশী আন্দোলনের এই বিপ্লবী শহীদ দেশপ্রেমের প্রতীকে পরিণত হন। তাকে নিয়ে অনেক অনেক গান রচিত হয়। সবচেয়ে মর্মস্পর্শী একটা গান হলো, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।' সেই ক্ষুদিরাম বসু ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমের প্রতীক হলেও ইংরেজের দৃষ্টিতে ছিলেন সন্ত্রাসী, খুনী।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মঙ্গল পান্ডে। গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করে যে কার্তুজ তৈরি করতো ইংরেজরা, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সিপাহীদের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত হানে সেটা। হিন্দু ধর্মে গরু ও মুসলমান ধর্মে শূকর নিষিদ্ধ। অথচ বন্দুক চালাতে গিয়ে প্রতিবারই গরু-শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজে কামড় বসাতে হচ্ছে এদেশীয় সৈন্যদের। এ নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পুঞ্জিভূত সেই ক্ষোভের বিস্ফুরণ ঘটে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা কয়েকজন ইংরেজ সেনা অফিসারকে হত্যা করে। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ইংরেজরা নৃশংস হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। প্রাণ যায় হাজার হাজার মানুষের। পুড়ে ছাই

হয় বাড়িঘর। দিল্লীর রাস্তার দুই পাশের গাছগুলিতে ঝুলে থাকে চৌদ্দ হাজার আলেমের লাশ। মঙ্গল পাণ্ডে ধরা পড়েন এবং ইংরেজের বিচারে তার ফাঁসি হয়। পরবর্তীকালে তাকে নিয়েও চলচ্ছিত্র নির্মিত হয়েছে। সেই মঙ্গল পাণ্ডে কিংবা চৌদ্দ হাজার সংগ্রামী আলেম ভারতবাসীর কাছে বিপ্লবীর মর্যাদা পেলেও ইংরেজের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসী।
শহীদ সূর্যসেন, যিনি চট্টগ্রামে ইংরেজের অস্ত্রাগার লুট করেছিলেন, তাকে নিয়েও লেখা হয়েছে প্রচুর কবিতা। কিন্তু ইংরেজরা তাকেও হত্যা করে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে। এদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লড়াই শুরু করে ওয়াহাবিরা। শহীদ তিতুমীর ছিলেন ওয়াহাবি ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত একজন সংগ্রামী। তার 'নারকেলবাড়িয়ার জঙ্গ' বা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আমাদের কাছে বিপ্লবী ইতিহাসরূপে সমাদৃত। কিন্তু সেই তিতুমীরকে ইংরেজরা বলতো, ধর্ম-উম্মাদ,সন্ত্রাসী।
আজকের পৃথিবীতে একটা অতি উচ্চারিত শব্দ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ বা টেরোরিজম। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তাদের প্রচারমাধ্যমেই অহরহ শোনা যায় এ শব্দ। এবং যাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এরা উদ্বাস্তু কিংবা দখলদারের কাছে বাড়িঘর হারানো দুঃখী মানুষ। তখন প্রশ্ন জাগে, 'সন্ত্রাসবাদ' আসলে কী? স্বাধীনতার জন্য লড়াই আর সন্ত্রাস কি একই কথা? অথবা, কী সেই কারণ, যার কারণে জন্ম হচ্ছে 'সন্ত্রাসবাদের'?
পশ্চিমারা আজকাল সন্ত্রাসবাদের কারণ হিসেবে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে দায়ী করেছে। বিশেষ করে ইসলামের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে তারা। পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা ইতোমধ্যে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সমার্থক শব্দ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের মুখে এটাও শোনা যায়, ইসলাম এমন একটা ধর্ম, যার ইনফ্রেস্টাকচারের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদী চিন্তাভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। তাদের এই দাবি কতোটা সত্য, সেটা দেখার আগে আমরা চেষ্টা করবো অন্য ধর্ম ও ভাবাদর্শে থাকা সন্ত্রাসী সংগঠনের একটা ছোট্ট তালিকা তৈরি করতে, এতে সন্ত্রাসবাদের হকিকত বোঝা আমাদের জন্য সহজ হতে পারে।
হামাস কিংবা বিন লাদেনের আল কায়দার বহু আগেই সুইসাইড স্কুয়াড বা মানববোমা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছিলো শ্রীলংকার তামিল টাইগার বা এলটিটিই। এরা কিন্তু ধর্মে হিন্দু এবং বিশ্বের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত। তারচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, এরা পৃথিবীর একমাত্র জঙ্গি, যারা সে দেশের সরকারি স্থাপনায় বিমান হামলা পর্যন্ত করেছিলো। যাদের রয়েছে নিজস্ব বিমান ও নৌ-বাহিনী। নেপালের সাবেক্ প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল প্রচণ্ড ছিলেন মাওবাদী গেরিলা নেতা। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় জঙ্গি মাওবাদীরা প্রচণ্ড সন্ত্রাসী সংগঠন

হিসেবে পরিচিত। এই মাওবাদী গেরিলাও হিন্দুদের হাতে তৈরি। ভারতের পূর্বাঞ্চলের 'সেভেন সিস্টার্সে' স্বাধীনতাকামী যে সংগঠনগুলো লড়ছে, ধর্ম বিশ্বাসে তারা হিন্দু। ভারত তাদেরকে বলে আতংবাদী।
নর্দান আয়ারল্যান্ডের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, ব্রিটিশরা যাদেরকে বলতো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী, তারাও বিশ্বাসী ছিলো খ্রিষ্টধর্মের। খ্রিষ্টধর্মে গভীর অনুরাগী বাস্করা স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। স্পেন এদেরকে আখ্যায়িত করে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে। কম্বোডিয়ার পলপটের আমলে খেমারজরা ছিলো বৌদ্ধ, যাদের সন্ত্রাসী বলা হতো। ইহুদি 'ইরগুনজাই' 'হাগানা' 'স্ট্যার্ন গ্রুপের' মতো সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আরবদের উৎপাত শুরু করে এবং সর্বাত্মক গুপ্ত হত্যায় মত্ত হয়, যার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের বসনিয়ার গণহত্যার তুলনা চলে। লাতিন আমেরিকার ইতিহাস ঘাঁটলেও মৌলবাদী খ্রিস্টানদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অনেক নজির মিলবে। সুতরাং সন্ত্রাসের প্রজননকেন্দ্র বা আঁতুড়ঘর হিসেবে ইসলামকে চিহ্নিত করা যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা বলাই বাহুল্য।
স্বাধীনতাকামী, সন্ত্রাসী বা আতংবাদী যে নামেই ডাকি, এরা যে কেবল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নয়, অন্য ধর্মে বিশ্বাসীরাও যে এই দলে আছে, এমনকি সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী আদর্শগুলোও যে নানাভাবে সন্ত্রাসকে পুষ্ট করেছে, তার প্রমাণও মেলে ইতিহাসে। নাজিজম-ফ্যাসিজমের কথা তো সবারই জানা।
সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতার আড়ালে বিশ্ব সন্ত্রাস চালিয়েছে আজকের সেক্যুলার ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো। হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি এখনও মুছে যায় নি। বিন লাদেনের তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাস নিয়ে আমেরিকা যে বাণিজ্য করছে, বিশ্ব জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে আমেরিকার ধর্ম উম্মাদনাময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের খবর কী? নাইন-ইলেভেনের বিমান হামলার পর প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে নিহতদের জন্য যে প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সে আহ্বানের কথাগুলো ছিলো এরকম: আমি প্রার্থনা করি, এমন একটি শক্তি আজ তাদের পাশে দাঁড়াবে, যে সকল শক্তির চেয়ে বড়। যুগ যুগ ধরে তেইশতম সমাচার (বাইবেল) যা বলে এসেছে... যদিও আমি মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকার মধ্যদিয়ে হেঁটে যাচ্ছি তবু আমার ভয় নেই, কারণ ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। পরক্ষণেই তার উচ্চারণ: এই কাজ (বিমান হামলা) যারা করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে উভয়ের মধ্যে আমরা কোনো ফারাক রাখবো না। যেখানেই থাকুক আমরা তাদেরকে খুঁজে বের করবো, তাদের বিচার করবো।
এই 'বিচারের' পরিণতিতে আফগান-ইরাক দোযখে পরিণত হলো। লাখ লাখ

নিরীহ মানুষ, নারী ও শিশুর প্রাণ গেলো। জর্জ বুশ এই যুদ্ধকে ক্রুসেড ও ইনফিনিটি জাস্টিসের সঙ্গে তুলনা করলেন, যে বিষয়গুলো খ্রিস্টান ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। তার মানে বুশও ধর্মকে আশ্রয় করে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে নামলেন এবং এই ধ্বংসযজ্ঞকে জায়েয করার জন্য ধর্ম থেকেই বৈধতা খুঁজলেন। তাহলে বুশকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী বললে কি অন্যায় হবে?

আজকের পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোতে 'সন্ত্রাসবাদ' একটি অতি উচ্চারিত বিষয়। এই বিষয়টিতে কাঁচামাল হিসেবে তারা ইতোমধ্যে বিন লাদেনকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। কিন্তু বিন লাদেনকে তার সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে কেউ বিচার করে নি। কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বিশ্বজোড়া তার কুকীর্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে ঢাকতেই বিন লাদেনকে বার বার সামনে খাড়া করেছে। এটা নতুন নয়, সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই সন্ত্রাসবাদের বিরোধীতার আড়ালে সন্ত্রাসকেই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়।

নাইন-ইলেভেন কিংবা বিন লাদেন একদিনে তৈরি হয় নি। লাদেনের মনও একদিনে আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে নি। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকে পবিত্র ভূমি জাযিরাতুল আরবে বিধর্মী মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি, যুদ্ধের পর ইরাক অবরোধের কারণে সে দেশের মানুষের সীমাহীন দুর্দশা, শিশুদের মৃত্যু, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের দখলদারীত্বে মার্কিন সমর্থন– এসব কারণই বিন লাদেনকে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমেরিকার শত চেঁচামেচির পরও লাদেনের মার্কিন বিরোধী জিহাদ আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণটা অবশ্য মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে নিহিত। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও দালালীর কারণে সাধারণ মানুষ ফুঁসছে। অপদার্থ শাসকগোষ্ঠীকে দেশের জনগণের ক্ষোভ থেকে আড়াল করতে এগিয়ে আসছে আমেরিকা এবং এদের দ্বারা ইচ্ছে মতো নিজেদের সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছে। এই সুবিধা ভোগ করতেই আমেরিকা চায় না ঐ দেশগুলোতে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। যে কারণে দেখি, ইরাক-আফগানে বোমা মেরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও মধ্যপ্রাচ্যের জুব্বাওয়ালা শেখদের রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখছে ঠিকই। কারণ এতে যে আমেরিকারই লাভ। এই অবস্থায় মানুষ যে আমেরিকাকে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, আশ্চর্যের কী?

আজকের বিন লাদেন কিংবা সন্ত্রাসবাদ হলো বিশ্বজোড়া মার্কিনীদের বেইনসাফির ফল। মানুষ যখন অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার হয়, দেয়ালে পিঠ ঠেকে তখন বিদ্রোহী না হয়ে পারে না। এটা মরার আগে শেষ ঝাকুনি দেয়ার মতো। যেদিন আমেরিকা বিশ্বজোড়ে তার আগ্রাসন থামিয়ে দেবে বিন লাদেন

বা সন্ত্রাসবাদীদের কণ্ঠস্বরও সেদিন ফুরিয়ে যাবে। তাই আজকের সন্ত্রাসবাদ হলো পরাশক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের ফল। লাদেন বা তালেবানদের কথাই ধরি, এই তালেবানদের লালনকর্তা কে? আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের পর গণতন্ত্রী আমেরিকাই তো তালেবানদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়েছিলো, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানের মাটিতে একটা ভিয়েতনাম যুদ্ধ উপহার দিতে। এখানে তালেবানকে সাহায্য করা মানে শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিকে খর্ব করা। হলোও তাই। পুরনো শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি খর্ব হলো তার পর এগিয়ে এলো মার্কিনীরা। আবির্ভূত হলো বিশ্বের এক নাম্বার পরাশক্তি হিসেবে। এর পরের ঘটনা তো সবারই জানা। সোভিয়েত আগ্রাসনের পর মার্কিন আগ্রাসন শুরু হলো। ফলে বিন লাদেন ও তালেবানরা ঘুরে দাঁড়ালো মার্কিনীদের বিরুদ্ধেই। পিতা ও পুষ্য পুত্রদের লড়াইয়ে তপ্ত হলো পৃথিবী। তাহলে ফলাফল দাঁড়ালো এই: সন্ত্রাসবাদের কার্যকারণ ইসলাম নয়, সাম্রাজ্যবাদের বেইনসাফি। সেই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে দুই পরাশক্তির অন্যায্য কর্মকাণ্ডের কারণেই তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বাড় বাড়ন্ত হয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে শান্তিকামী মানুষের মধ্যে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব যে দিন দিন বাড়ছে, তার মূলে আছে একটি গভীর অসুখ– যার নাম ফিলিস্তিন। আজ ইসলামী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মার্কিনীরা যে হইচই করছে তার প্রেক্ষাপট ও বিকাশের ক্ষেত্র তো ঐ ফিলিস্তিনই। পত্র-পত্রিকা ও টিভিতে যে আমরা দেখি, ফিলিস্তিনী শিশু-কিশোররা দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুড়ছে, তাদের একেকটি ঢিলের বিপরীতে ইসরাইলী সৈন্যদের মারণাস্ত্রগুলো গর্জে উঠছে, এই শিশুরা লাশ হচ্ছে– এদের অপরাধ কী? অথচ পশ্চিমা একচোখা প্রচারমাধ্যমগুলি ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার সংগ্রামকে যতটা সম্ভব বিকৃত করে দেখায়। তাদের চোখে ফিলিস্তিনী শিশু-কিশোররা সন্ত্রাসী আর দখলদার ইসরাইলী সৈন্যরা এনজেল। এই অসম যুদ্ধ, ফিলিস্তিনীদের উপর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, আবার তাদেরকেই দোষী বানানোর অপচেষ্টা এটা বিশ্বাবাসীর সামনে পরিষ্কার। বিশ্ববাসী দেখছে ফিলিস্তিনী মজলুম জনগণ একই সঙ্গে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও জায়োনিজমের বিরুদ্ধে লড়ছে। আজকের সভ্য পৃথিবীতে মানবাধিকারের বিধি-বিধান ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কে যে সব আধুনিক চুক্তি, সনদ ঘোষণা আছে এতে এতোদিনে ফিলিস্তিনীদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবার কথা। কিন্তু হয় নি। এটা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষকে পশ্চিমা বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুব্ধ করে তুলছে। সভ্য দুনিয়ায় মানবাধিকারের এই যখন অবস্থা, তখন বিন লাদেন

এসে যখন মার্কিন বিরোধী জেহাদের ডাক দেয় তখন অতি সহজেই এটা মজলুম মানুষের অনুমোদন পেয়ে যায়। লাদেনের কণ্ঠস্বরকে তখন নিপীড়িত মানুষেরা মনে করে নিজেদের কণ্ঠস্বর।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদারির একষট্টি বছর হয়ে গেছে। এই একষট্টি বছরে অনেক রক্ত ঝরেছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। প্রথম কয়েক দশকে ফিলিস্তিনীরা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছিলো কিন্তু কাজ হয় নি। তখনও সুইসাইড স্কুয়াডের জন্ম হয় নি। আত্মঘাতি হামলার ঘটনা ঘটে আরও পরে। ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল ইসরাইলের আফুলা শহরে। এর কিছুদিন আগে (২৫ ফেব্রুয়ারি-৯৪) হেবরন শহরে নামাজরত অবস্থায় ২৯ জন মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করে জায়োনিস্ট নেতা বারোক গোল্ডস্টাইন। তার বদলা নিতে এবং ফিলিস্তিনের প্রতি বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে আত্মঘাতি মানব বোমার জন্ম হয় ফিলিস্তিনে। এর পর থেকেই চলছে।

আত্মঘাতি মানব বোমা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ফিলিস্তিনী যুবক ইউনুসের স্বীকারোক্তি এরকম: আমি ভালো করেই জানি ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই করতে পারবো না, মুহূর্তেই ট্যাংক পিষে ফেলবে। তাই নিজেকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবো। এরা এটাকে বলে সন্ত্রাসবাদ। আমি বলি আত্মরক্ষার লড়াই। (Inside the world of the Palestine suicide bomber, the Sunday times, London) ফিলিস্তিনী যুবকদের এই আত্মঘাতি বোমা হামলাকে যদি সন্ত্রাস বলি তবে যারা তাদেরকে এই কাজ করতে বাধ্য করছে তাদেরকে কী বলবো? তাই আজকের সন্ত্রাসবাদের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরাই দায়ী। মার্কিন দখলদারীর আগে ইরাকে আত্মঘাতি বোমার নজির ছিলো না। মার্কিনীদের দখলদারী ও অত্যাচারের পরেই এর সূত্রপাত। আফগানিস্তানেও তাই। অতএব স্বীকার করতেই হবে পশ্চিমা দখলদারী ও আধিপত্যবাদের মধ্যেই সন্ত্রাসের বীজ লুকিয়ে আছে, ইসলামের মধ্যে নয়।

আজকের পশ্চিমা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে গবেষণা চলছে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা এটাকে বলছে মনোবিকলনের সমস্যা। এতে তাদের সুবিধা। সন্ত্রাসবাদকে রোগ হিসেবে ধরে নিলে বিশ্বজুড়ে তাদের অন্যায় অত্যাচারের দিকগুলি আড়াল করা যাবে। অনেক সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আসলে পশ্চিমারা হানাদারিতে যেমন পাকা, তত্ত্ববাজিতেও তেমনি নিপূণ। কিন্তু তাদেরকে এই সত্যও মনে রাখতে হবে, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম চলবেই, তাকে যে নামেই ডাকা হোক।

সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী লুণ্ঠনের কবলে বিশ্ব

ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের পর আবু গারিব কারাগারে বন্দী ইরাকী তরুণী ফাতিমা বিশ্ববাসীর প্রতি আবেগঘন ভাষায় এক পত্র লিখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান সৈন্যদের হাতে সম্ভ্রম হারানো ফাতিমা তার পত্রে নিজের মৃত্যু কামনা করেন। তিনি আকুতি জানান, তাকে যেন মর্টারের গোলায় শেষ করে দেয়া হয়। বুশের নরকে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? ফাতিমা তাই মরে গিয়ে মুক্তি চেয়েছিলেন। ফাতিমার মতো শত শত তরুণী আছেন, যারা বুশের এই সর্বনাশা গ্রহ থেকে মুক্তি চান, মৃত্যু কামনা করেন। জীবনটা তাদের কাছে এখন বিশাল বোঝা। এই বোঝা বহন করে তারা চলবে কতদিন? তারচে মৃত্যু শ্রেয়।

সাম্রাজ্যবাদের অগ্রাসনে প্রতিদিন মরছে মানুষ,ধ্বংশ হচ্ছে জনপদের পর জনপদ। জ্বালাও! পোড়াও ! এটাই যেন পৃথিবীর অনিবার্য বিধিলিপি। এই আগ্রাসনে কেউ বাসস্থান হারায়, কেউ বুকের মানিককে হারায়। কেউ হারায় সংসারের একমাত্র উপার্জনক্রম ব্যক্তিকে। মৃত্যুর বিভীষিকায় কাটে মানুষের জীবন। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মানুষ মরছে, মরুক। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না, মুক্তির কথা ভাবাটাও পাপ। যদি প্রতিবাদ করো, তবে তুমি জঙ্গী ! তুমি সন্ত্রাসী! তোমার উপর চেপে বসবে অত্যাচারের বজ্র মুষ্ঠি। এই নিহত মানুষগুলোর শবদেহে একফোটা জল অর্পণ করাটাও সাম্রাজ্যবাদের চোখে অন্যায়। চিরস্থায়ী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে মানুষ। অসহায় মানুষ গুলো

না খেয়ে মরছে, অপুষ্টিতে ভুগছে। বিপরীতে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা হচ্ছে। ভোগের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে। কত অবাক এই পৃথিবী!
বর্তমান সময়ের আলোচিত শব্দ হলো সাম্রাজ্যবাদ। ইংরেজী ইম্পেরিয়াল শব্দের বাংলা হলো সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় "The system policy or practice of extending a nations authority by the establishment of economic and political hegemony over other nations. একসময় কম্যুনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বেশ মাতামাতি করলেও ইরাক-আফগান আগ্রাসনের পর তা মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কম্যুনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সাথে সংযুক্তি করে দেখাতে চেষ্টা করেন। লেনিন বলেন, Imperialism is the satae monopoly of capitalism. তবে কম্যুনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে মাতামাতি করলেও তাদের মধ্যে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আচরণ স্পষ্ট। যা আমরা দেখেছি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগান আগ্রাসনে ও চায়না কম্যুনিষ্টদের উইঘুর মুসলিমদের উপর দমন নিপীড়নমূলক আচরণে। আফগান বিকলাঙ্গ শিশুরা সোভিয়েত রাশিয়ার বর্বরতার সাক্ষী হয়ে আছে। তিব্বতের সাধারন মানুষের জীবন কাটে চায়নাদের বন্দুকের নলের তলে। পুঁজিবাদ যেমন মানুষকে শোষণ করছে তেমনি করেছে সমাজতন্ত্র। মানুষকে শোষণের অধ্যায়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ কেউ কারও চেয়ে কম যায়নি।

ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে পারসিক ও রোমান নামে দুটি সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। এরা মানুষকে শোষণ করেছে নির্দয়ভাবে। তাদের শোষণ-নির্যাতনে যখন মানুষের ত্রাহি দশা, ঠিক এই সময়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের উত্থানে এই দুই পরাশক্তির পতন হয়। পৃথিবীর মানুষ মুক্তি পায়, মুক্তির স্বাদ গ্রহন করে। গত শতাব্দীর দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়েছে আফগান মুজাহিদদের হাতে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনও পৃথিবীতে সদর্পে ঠিকে আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ,মাদক চোরাচালান,গুপ্তহত্যা, খুন, ধর্ষন ইত্যাদি জঘন্য কোন কাজ বাকী নেই যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে হচ্ছে না। ইরাক-আফগানে মুসলিম গণহত্যা,মধ্যপ্রাচ্যে তেল লুঠ, এশিয়ার গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা, সবই চলছে। বাজারের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা থাকায় কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ

হচ্ছে মানুষ। পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী রাখতে টন টন খাদ্য সমুদ্রে ফেলা হয়। অথচ মানুষ খাদ্য পায়না। মানুষের পৃথিবীতে খাদ্যের বড়ই অভাব। আফ্রিকার মানুষ খাদ্য পায়না। সেখানে এমনও মানুষ আছে, যারা জীবনধারন করে পোড়া মাঠি ও গাছের লতাপাতা খেয়ে। অথচ আফ্রিকার কিসের অভাব, সেখানে তেল আছে,গ্যাস আছে, হীরক খন্ডের ভান্ডার আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের আধার যেন আফ্রিকার মাঠি। এই সম্পদই কাল হলো আফ্রিকার মানুষের। কারন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভালোই জানে,আফ্রিকার মানুষ যদি খাদ্য পায়, মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ায়, তাহলে সেখানে তেল লুঠ চলবে না, গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা হবে না। আফ্রিকার মানুষ খাদ্যে মরছে,মরুক। তাতে মার্কিনীদের যায় আসে কি।

পুঁজিবাদের মূল কর্ণধার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো পুঁজিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। একটি আদর্শের মূল লক্ষ্য থাকে তার প্রচার ও প্রসার। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের পুঁজিবাদী আদর্শের কর্ণধার, তাই পুঁজিবাদ প্রচার ও প্রসারে সারাবিশ্বে তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা। পুঁজিবাদের শাসনব্যবস্থার নাম হলো গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদ প্রকাশিত হয়ে মানুষকে শোষণ করে, শাসন করে। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যত পৃথিবীর বিপদ যে অত্যাসন্ন এতে সন্দেহ নেই। পুঁজিবাদ আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী সুন্দর ছিলো, রুপে যৌবনে লাবণ্যময় ছিলো। পুঁজিবাদ এসে পৃথিবীকে খাবলে খেলো, পৃথিবীর সব যৌবন শেষ করে দিলো। যেখানে মুনাফা সেখানেই পুঁজিবাদের হামলা। পানি যেমন নীচের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি পুঁজিবাদীরা ধাবিত হয় মুনাফার দিকে। সর্বোচ্চ মুনাফার দিকে। অতএব যেখানে মুনাফা আছে, সেখানে হামলা করো। লুঠে পুটে সম্পদের পাহাড় গড়ো। ভোগে 'শান্তি' ভোগেই 'সুখ'। এই ভোগের খেসারত দিতে হলো ইরাকী শিশুদের। আফগান অসহায় মা-বোনদের। ইরাকী শিশুদের অপরাধ, তাদের জন্ম তেলের উপর হয়েছে। আফগান মা-বোনদের অপরাধ, তাদের ঘরে কেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সৈনিকদের জন্ম হয়। অতএব জ্বালাও আফগান,পোড়াও ইরাক। মানুষ তেলের উপর বাস করবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে তা হবে না। মানুষের মূল্য 'তেলের' চে' বেশি নয়, মানুষের মূল্য 'মুনাফার' চে' অধিক নয়। পুঁজিবাদের ভোগের রাজত্ব কায়েম হলেই চলে।

আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে মানুষ জিম্মী হয়ে আছে। তথ্য প্রযুক্তির

অবিশ্বাস্য অগ্রগতি যেখানে মানুষকে সুখ দেয়ার কথা, সেখানে তা পারছে না। তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষ উন্নতি করতে পারছে না। কারণ মানুষ বাঁচবে, সুখে থাকবে এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চায় না। তারা মানুষকে শোষণ করবে, পায়ের তলায় পিষ্ঠ করবে। পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চলছে বহুমাত্রিকভাবে। এটা কখনো চলে গণতন্ত্রের নামে,কখনো বিশ্বায়নের মুখরোচক শ্লোগানে, কখনো হয় 'শান্তি' 'স্থিতিশীলতা' প্রতিষ্টার নামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র হলো,যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা করা। এর কাঠামো নিজের সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় সাজানো। জাতিসংঘ বলুন অথবা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর মতো বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথাই বলুন,সবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। জাতিসংঘের নিজস্ব চরিত্র,বৈশিষ্ট্র ও স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। জাতিসংঘ এখন পরিণত হয়েছে মার্কিনীদের সন্ত্রাসী ও দমনমূলক এজেন্সীতে। পৃথিবীতে মার্কিনীরা যত অপকর্ম করে, সব করে জাতিসংঘের মাধ্যমে । জাতিসংঘের কাজ হলো, পৃথিবীতে আমেরিকার পাপাচারকে বৈধতা দান করা। যুদ্ধ হাঙ্গামা বাঁধিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করা। সুতরাং জাতিসংঘকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আরেক নাম বলা যায়। অপরদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর মতো আর্থিক প্রতিষ্টান দিয়েও মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা চলছে। তারা দরিদ্র দেশগুলোর অলাভজনক খাতে ঋণ দেয়। ঋণের সাথে জুড়ে দেয় অনৈতিক কতক শর্ত। চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণের সুদ বাড়ার ফলে দরিদ্র দেশগুলো একসময় টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। তখন শুরু হয় দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর অনৈতিক হস্তক্ষেপ। রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টিকরে দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করা হয়। এই অস্থিতিশীলতার সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলোর খনিজ সম্পদ কেড়ে নেয়। জলে-স্থলে সবখানে তাদের অলিখিত দখল কায়েম করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি অস্ত্র উৎপাদন ও অস্ত্র বাণিজ্যের সাথে সংযুক্তি হওয়ায় পৃথিবীতে সংঘাত বাড়ছে, শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাকের কুয়েত আক্রমণ এসবের পেছনের কারণ ছিলো মার্কিনীদের অস্ত্র ব্যবসা করা। পৃথিবীতে যখন যুদ্ধ বাঁধে,তখন মার্কিন অর্থনীতির সূচক লাফিয়ে বাড়ে। কারন, এর দ্বারা মার্কিনীদের রমরমা অস্ত্র বাণিজ্য হচ্ছে। অতএব যুদ্ধ লাগাও, যুদ্ধ বাঁধাও। অর্থনীতি চাঙ্গা করো। এই যুদ্ধ নির্ভর অর্থনীতি পৃথিবীকে ধ্বংশের দিকে ঠেলছে। ভারত-পাকিস্থানের দীর্ঘদিনের বৈরী সম্পর্কও মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র বাণিজ্যের সুফল। বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো বিপজ্জনক ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র একটিও নেই। তারা সন্ত্রাস করে, যুদ্ধ করে খোলাখুলিভাবে। ইরাক-আফগান আগ্রাসনে যা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাপাচারের আকণ্ঠে নিমজ্জিত মানবসমাজ। এই অসাম্য,এই পাপাচার থেকে যেন মানবসমাজের মুক্তি নেই। মুনাফার লোভে তারা কি না করতে পারে,বউকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করায়, মেয়েকে বাজারী পণ্য বানায়। তাদের চোখে নারীর অঙ্গে অঙ্গে রুপ,অঙ্গে অঙ্গে মুনাফা। অতএব বউকে বেশ্যালয়ে পাঠাও, মুনাফা লুঠো। কন্যাকে পর্ণো পত্রিকার উলঙ্গ মডেল বানাও, মুনাফা লুঠো। পুঁজিবাদের কল্যাণে নারী এখন সম্মানের পাত্র নয়, ব্যবসার পণ্য। মা,কন্যা, জায়া মুখ্য নয়, মুখ্য মুনাফা। ভোগের রাজত্বে মুনাফাই প্রভু।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে অন্য কোন ব্যবস্থার উপস্থিতি বিশ্বে আমেরিকা চায় না। কারন আমেরিকা জানে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি মাকড়শার জালের মতো নিপুণ করে তৈরি হলেও তা খুবই দূর্বল। সামান্য ধাক্কার ধকল তা সইতে পারে না। এজন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি বারবার সংকটে পড়ে, হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। সর্বশেষ দু' হাজার আট সালেও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভয়াবহ সংকট দেখা যায়। যা এখনও কাটেনি। আফগানে যখন ইসলামী খেলাফতের উত্থান হলো, তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেশ ভয়ের মধ্য ছিলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থা বিশ্বে দাঁড়িয়ে যাওয়ার। আমেরিকা দেখলো, পুঁজিবাদ টিকাতে হলে আফগান ঠেকাতে হবে। নয়তো পুঁজিবাদের ধ্বংশ পৃথিবীতে অনিবার্য। অতএব আফগানে আগ্রাসন চালাও। নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে দাও। আফগান ঠেকলে পুঁজিবাদ টিকবে। আফগানের যুদ্ধ তাই পুঁজিবাদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পুঁজিবাদ হারলে পৃথিবীতে তাদের পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ঋণ করে ঘি খাওয়া

খবরটা মোটেও সুখকর নয় যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঘাড়ে দশহাজার পাঁচশ টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা চাপানো। যে শিশুটি জন্ম নিলো আজ, সেও এই ঋণের সমান অংশী। যে রিকশাঅলা সারাদিন ঘাম ঝরিয়েও দু'বেলা পেটপুরে খেতে পারে না, যে দিনমজুরের শরীরের ঘাম কখনও শুকায় না, আগের দিনের শ্রমমাখা ক্লান্ত শরীর শান্ত হবার আগেই আবার ছুটে চলে মাঠে, তার ঘাড়েও দশহাজার পাঁচশ টাকা ঋণের বোঝা। যে পাগল লোকটি জগত সংসারের কিছুই জানে না, বুঝে না। সারাদিন বসে থাকে পথে, বক বক করে, তার ঘাড়েও সমপরিমাণ ঋণ। তবু ঋণ আসছে, ঋণ হচ্ছে, দেনা বাড়ছে প্রিয় বাংলাদেশের। প্রশ্ন হলো এতো ঋণ কে আনে, কে দেয়, কোথায় যায়? হ্যাঁ, ঋণ দেয় বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ'র মতো লুণ্ঠনকারী সংস্থাগুলো, গ্রহণ করে দেশীয় দুর্নীতিবাজ সরকার ও তার আমলা এবং তারাই ইচ্ছে মতো লুঠপাট করে। কিন্তু দায় বহন করে দেশের খেটে খাওয়া মানুষেরাই।

বাজেটের একটা বড় অংশ বরাদ্দ থাকে সুদের জন্য। মোট বাজেটের চৌদ্দ থেকে পনের শতাংশই সুদ মেটাতে চলে যায়। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ'র মতো লুণ্ঠনকারী সংস্থা যে ঋণ দেয় তার মাশুল গুণতে হয় এটা দিয়ে। এবং এটা পরিশোধ করে জনগণই।

মন্ত্রী ও আমলারা একটা প্রকল্প খাড়া করে। সেই প্রকল্প থেকে দুর্নীতি ও লুঠপাটের ব্যবস্থা হয়। এবং পরের দিনগুলোতে এটার সুদ মেটাতে হয় জনগণকে। এই হলো মোটামুটি অবস্থা।

সরকার বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ'র কাছ থেকে যে অর্থ আনে, সে অর্থকে বিশ্বব্যাংক ও সরকার উভয়েই বলে 'সাহায্য' অথচ আনে ঋণ; যে ঋণের দায়গ্রস্ত হয় দেশ-বিদেশে থাকা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক। অথচ প্রকল্প তৈরি, খরচ করা, প্রকল্প বরাদ্দ সবই করে সরকার ও বিশ্বব্যাংক। লুঠপাটও করে তারাই। কিন্তু দায় বহন করে জনগণ।

এই যে এতো এতো ঋণ আসছে। ঋণের ভারে কুঁজো হচ্ছে দেশ, তার কতটা অর্থ ব্যয় হচ্ছে দেশের উন্নয়ন খাতে? খোদ বিশ্বব্যাংক'র এক প্রতিবেদন বলছে : বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে যে ঋণ আসে, তার ৬০ শতাংশ হয় অপচয়, ২০ শতাংশ পায় বিভিন্ন পরামর্শকরা, আর ২০ শতাংশ ব্যয় হয় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এই রিপোর্টটি উদ্বেগজনক, বলার দরকার আছে কি?

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আমাদেরকে যে 'সাহায্য' দেয়, সেটা চার ধরনের। এগুলো হলো, প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও কারিগরী সাহায্য। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ঋণ হিসেবে, শেষেরটি অনুদান। ঋণের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে সুদের হারটা তুলনামূলক কম হলেও খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের বিপরীতে সুদের হারটা চড়া। এই অবস্থায় অপচয় ও পরামর্শ ফি বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে শতকরা বিশ টাকাই ব্যয় হয় দেশের জন্য। এবং এর জন্য জাতিকে সুদ মেটাতে হয় পুরো একশ টাকার। এটা যে পুঁজিবাদের কতো বড় শোষণ, সহজেই অনুমেয়।

২০০৯ সালের এক হিসেব অনুযায়ী, ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে, তার পরিমাণ মাথাপিছু দশহাজার টাকা। অর্থাৎ ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে, তাকেও দশহাজার টাকা বৈদেশিক ঋণের বোঝা নিয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। অথচ এই দশহাজার টাকার মধ্যে আটহাজার টাকাই অপচয় হয়েছে। বাকি দুইহাজার টাকার সুবিধাও এই শিশুটি অথবা তার আত্মীয়-স্বজন উপলব্ধি করতে পারে নি। বলাবাহুল্য, সেই ঋণের পরিমাণটা এখন আরও বেড়েছে। সেটা মাথাপিছু দশহাজার থেকে উন্নীত হয়েছে সাড়ে দশহাজারে। মাশাআলাহ।

প্রশ্ন হলো এই টাকাগুলো কোথায় যায়? হ্যাঁ, যায় দুর্নীতিবাজদের পকেটে।

তারাই লুঠেপুটে খায়।
এই দুর্নীতিবাজ শুধু সরকার এটা না, তার সঙ্গে দুর্নীতিবাজ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, অন্যান্য বহু পাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থা, বহু জাতিক কোম্পানী। তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি শক্তিশালী এনজিও মহল, যারা নিজেদেরকে সুশীল সমাজ বলে অভিহিত করে। এরপরে আছে দেশীয় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও চোরবাটপার চক্র। সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই লুণ্ঠিত হয় এই অর্থ।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ'র মতো লুণ্ঠনকারী সংস্থা আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সুদি ঋণের চকচকে মোড়ক নিয়ে হাজির হয়। দরিদ্র দেশটি যখন ঋণের প্যাকেজ নিতে আগ্রহী হয়, এরা তখন জুড়ে দেয় বিভিন্ন শর্ত। তাদের জুড়ে দেয়া এই অনৈতিক শর্তগুলো মেনে নিয়ে দেশটি যখন বাধ্য হয়ে ঋণ নেয়, তখনই আস্তে আস্তে তারা ওই দেশের অঘোষিত মোড়লে পরিণত হয়। নাক গলায় তাদের অভ্যন্তরীন বিষয় আশয়ে। পরামর্শ দেয় 'উন্নয়নের'। তাদের কুপরামর্শ অনুযায়ী যখন চলতে থাকে দেশটি। দেখা যায় ঋণ দায়গ্রস্ত দেশে পরিণত হয় সে। অর্থনীতি নামে তলানির দিকে। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক, ১৯৭১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক'র পাঁচটি সংস্থার মধ্যে আইএমএফ বাংলাদেশকে ১৮২টি কর্মসূচিতে নয় দশমিক চার বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক'র ঋণ সহায়তায় চালু হয় ২৬টি প্রকল্প। এই প্রকল্পের বেশির ভাগই আজ দেশের জন্য মারাত্মক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন সময় যে ঋণ দিয়েছিলো, সেই ঋণকে অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় করার জন্য সরকারকে চাপ ও কুপরামর্শ দিয়েছে। ফলে এ খাতে আজ পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কোনো উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু সুদ দিতে হচ্ছে ঠিকই। পাটশিল্পে এ্যাডজাস্টমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক যে ঋণ দিয়েছিলো, সেই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার আগেই তারা আবার ঋণ বন্ধ করে দেয়। ফলে বাংলার সোনালী আঁশের ঐতিহ্যটি এখন বিস্মৃতির দ্বারে উপনীত।
স্বাস্থ্য খাতে এইচপিএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে চার হাজার ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য শর্ত সাপেক্ষে যে ঋণটি দিয়েছিলো, পদ্ধতিগত ভুলের কারণে সেই প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। দেশের নয় হাজার হেক্টর জমি ওই ক্লিনিকের জন্য নষ্ট হয়। পল্লীর মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাবে কী, উল্টো ক্লিনিকগুলোই পড়ে আছে বন্ধ হয়ে। কিন্তু ঋণের সুদ আমরা দিয়েই যাচ্ছি।
কারা শোধ করছে এই ঋণ? কাদের রক্ত পানি করা উপার্জনের পয়সায় মেটানো

হচ্ছে সুদখোর বিশ্বব্যাংকের ঋণ? ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা লোকদের? আমলা কিংবা ধনীক শ্রেণীর? জ্বি না, ঋণ মেটানো হচ্ছে গার্মেন্টসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা ওই মেয়েটির উপার্জন দিয়ে, যে-বেতনের টাকা চাইতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়, যে সকাল হবার আগেই টিফিন হাতে ছোটে চলে ঢাকা শহরের পথে, যে সস্তায় শ্রম বিক্রি করে অকল্পনীয় নিষ্ঠুর পরিবেশে, এবং এই সস্তায় শ্রম বিক্রিকে বাঞ্ছনীয় মনে করে এর বাইরে আর কিছু করার নাই বলে। ঋণ মেটানো হয় পরিবার-পরিজন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে অসহ্য লু হাওয়ার মধ্যে পরিশ্রম-কাতর কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর বাংলাদেশী শ্রমিকের রক্ত পানি করা উপার্জনে; আর মালেশিয়ার রাবার বাগানে অসহায় লেবার, ইউরোপে পালিয়ে থাকা তথাকথিত 'অবৈধ' শ্রমিক কিংবা নিউইয়র্কে ডাকাতের ভয় নিয়ে চলা বাংলাদেশী ট্যাক্সি চালকের টাকায়। হ্যাঁ, এদের পাঠানো টাকায় শুধু সুদখোর বিশ্বব্যাংকের ঋণই মিটছেনা, চলছে দেশও। এদের রক্তে আর ঘামে চলছে বাংলাদেশ। এদের হাড়-মাংস-অস্থি-মজ্জার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা বহন করছি এই দেশ। এবং তাদেরই রক্ত খেয়ে টিকে আছে এদেশের ধনীক শ্রেণী। বিদেশে যে শ্রমিকরা কাজ করে, নিশ্চয়ই তারা সেখানে আহ্লাদে আটখানা হয়ে থাকে না, তারা সেখানে সে সব কাজই করে, যা সেখানকার স্থানীয় লোকেরা করতে অসমর্থ। এটা তো দাসপ্রথাই এক প্রকারের। কিন্তু তাদের কথা ভাবে কে! যারা পরবাসে কষ্টকর মজুর-দাসের জীবন কাটাচ্ছে, তাদের পাঠানো ইউরো, ডলার, পাউন্ট, দিনার-দিরহাম-রিংগিটে বাংলাদেশ চলে। এদের মধ্যে যারা নারী শ্রমিক, যারা কাজ করছেন নার্স, হাউসমেইড হয়ে পরবাসে, যারা তিল তিল করে জমানো টাকা পাঠাচ্ছেন দেশে, তাদেরই কষ্ট করে আয় করা অর্থ সুদে-আসলে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সুদখোর প্রতিষ্ঠানগুলো।

দেশের ভেতরেই ফিরে আসি আবার। বলা হয়, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। কে করছে সেই আয়? শুধু ব্যবসায়ীরা? এখানে শ্রমিকের ভূমিকা নেই? আমরা রপ্তানী করছি চিংড়ি। রপ্তানী করছি পোশাক। কিন্তু এগুলো উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের খবর কী?

আমরা চিংড়ি রপ্তানী করছি। সেই চিংড়ি বিদেশীরা তৃপ্তি ভরে ভক্ষণ করছে। করুক, তাতে ঈর্ষার কিছু নাই। তাদের পয়সা আছে, ভোগ তো করবেই। কিন্তু এই চিংড়ি উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের খবর কী, সেটা জানার প্রয়োজন অনুভব করে না রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের যারা কর্তা, তারা এই ভেবে সুখ পান যে, চিংড়ি রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। কিন্তু কে আয় করছে এই মুদ্রা? কার পকেটে যাচ্ছে এগুলো?

পোশাকশিল্পে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে সব চেয়ে বেশি– হরহামেশা শোনা যায়

এমন কথা। কিন্তু যে মেয়েরা এই শিল্পে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত, সকালবেলা টিফিন হাতে দল বেধে যাদের ছুটতে দেখা যায়, তাদের অবস্থা কী? কয় টাকা বেতন পায় তারা? প্রাপ্য চাইতে গেলে তাদের দিকে তেড়ে আসা হয় কেন? গার্মেন্টসগুলিতে যারা কাজ করছে, মালিকপক্ষ যে সেই মেয়েদেরকে শ্রমিক হিসেবে পছন্দ করে, তার কারণ তো এই নয় যে, তারা নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করতে চায়; বরং এটাই সত্য যে, নারীর শ্রম সস্তায় পাওয়া যায়।

যা-ই হোক, খেটে খাওয়া মানুষের উপর রাষ্ট্রের শোষণ ও পীড়ন নতুন নয়। এটা আগে যেমন ছিলো, এখনো তেমনি আছে। পাকিস্তান আমলে ছিলো, ব্রিটিশ আমলেও ছিলো। পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে, পাট উৎপাদন করতে গিয়ে বাংলার কৃষক জোঁকের কামড় খায়, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, আর পাট বিক্রির টাকা নিয়ে রাষ্ট্রের মালিকরা যুদ্ধাস্ত্র কেনে, ইসলামাবাদে রাজধানী বানায়, আমাদের শোষণ করে। ব্রিটিশ আমলেও দেখা গেছে একই চিত্র। দেখা গেছে, বাংলার চাষীরা নীল চাষ করেছে। চাষ করতে নির্দয়ভাবে বাধ্য করা হয়েছে। সেই নীল রপ্তানীর সবগুলো মুনাফাই চলে গেছে ঔপনিবেশিক নীলকরদের হাতে। বাংলার কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে।

শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রমে উপার্জিত গরম টাকার প্রতি দুর্নীতিবাজদের প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংকের বিরাট লোভ। তারা ওই টাকাগুলো লুণ্ঠন করে হাতিয়ে নিতে সর্বদাই মুখিয়ে থাকে। দালাল তৈরি করে দেশে দেশে। হাত করে আমলাদের। ওই গরম টাকার লোভে আমলারাও হাত হয়ে যান। তারা খুব সহজেই বিশ্বব্যাংক বা দাতা সংস্থার কোনো একটি প্রকল্পে দস্তখত করে জনগণের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেন। সে বোঝা আর হালকা হতে চায় না। সে ঋণ জনগণের ঘাম ও রক্তের দামেও শেষ হতে চায় না। দেউলিয়া হওয়ার পথে এগিয়ে চলে দেশ।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন বলছে : ঋণ গ্রহণের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অচিরেই ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা হারিয়ে ঋণ দায়গ্রস্ত দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। ২০০৮ সালের ১৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ 'ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বিশেষণ' নামে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

তাহলে সমাধান কী? সমাধান একটাই, পুঁজিবাদী সুদখোর প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অনুৎপাদক লেনদেন বন্ধ করতে হবে। নয়তো ঋণ করে ঘি খেয়ে খেয়ে একদিন দেউলিয়া হতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন : পুঁজিবাদের পাপাচার ও বিপর্যস্ত পৃথিবী

পৃথিবী ভালো নেই। পৃথিবীর মন ভালো নেই। জলবায়ু পরিবর্তনে সে বিপর্যস্ত ফলে পৃথিবীর সব প্রাণের ভবিষ্যৎ সংকটের মুখোমুখি। পৃথিবীর এই সংকাটাপন্ন অবস্থা কি উপলব্দি করতে পারেন জলবায়ু সম্মেলনের নামে বালি আর কোপেনহেগেনের রঙ্গমঞ্চে বসা বিশ্ব নেতারা। মুনাফার লোভে অন্ধ হওয়া এই বিশ্ব নেতারা কি বোঝেন পৃথিবীর দুঃখ, পৃথিবীর বেদনা। তারা যখন বালি-কোপেনহেগেনের রঙ্গমঞ্চে বসেন, জাতিসংঘ নামক নাট্যশালায় প্রহসন করেন, তখন পৃথিবীর উদ্বিগ্ন মানুষের কথা একটি বারও ভাবেন কি? তাদের মনোভাব জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবী গোল্লায় যাক আমরা আরও বেশি কার্বন নিঃসরণ করে যাব, পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তুলব। মানুষ মরুক তাতে আমাদের কি যায় আসে।

কিন্তু পৃথিবী বসে নেই। আঘাতের পর পাল্টা আঘাত করতে রুদ্ররূপ ধারন করেছে পৃথিবী, অশান্ত হচ্ছে, প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌণঃপুণিক বৃদ্ধিসহ দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সিডর, আইলা, সমূদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি ও খরা সমস্যা ইত্যাদি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রশ্ন হলো এজন্য দায়ি কারা? সোজা কথায় এর জন্য দায়ি পুঁজিবাদীরাই। পুঁজিবাদীরাই নির্দয়ভাবে জ্বালানি পোড়াচ্ছে মুনাফার আশায়, বোমা মারছে

জনপদে জনপদে, তপ্ত করছে পৃথিবীকে। এর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যাচ্ছে,অসুখ বিসুখ বেড়ে যাচ্ছে প্রাণীকূলের। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে পুথিবীর জীববৈচিত্র।
জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের ফল। জলবায়ুর পারিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মনুষ্যসৃষ্ট কর্মকান্ডের জন্যে দায়ী এবং যে পরিবর্তনটি দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য । জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থায়ী কারণগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশই মানবসৃষ্ট। মুলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়াসহ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের ভোগবাদী মানসিকতাই এতে বড় ভূমিকা রাখছে। নিত্যনতুন গাড়ি উৎপাদন, বিলাসদ্রব্যের লাগামহীন ব্যবহার, কলকারখানায় কার্বন নিঃসরনের পরিমাণ বাড়িয়েছে। আর পৃথিবীর গর্ভ থেকে লাখ লাখ ব্যারেল তেল বের করে পশ্চিমাদের ব্যাপকহারে পোড়ানোর ফলে বায়ুমন্ডলে বাড়ছে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ।
বিজ্ঞানীদের আশংকা এভাবে কার্বন ঘণীভবনের পরিমাণ বাড়তে থাকলে এই শতাব্দী শেষে পৃথিবীর মোট তাপমাত্রা দাঁড়াবে ৩০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর ভোগবাদী আচরণ ও অতি মুনাফার লোভ পৃথিবীকে ধ্বংশের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পরাশক্তি আমেরিকা যে কোনো মূল্যে পৃথিবীতে তার আধিপত্যে কায়েম রাখতে চায়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনে যখন পৃথিবীর মানুষ উদ্বিগ্ন, তখন তারা কার্বন নিঃসরন আরও বাড়িয়েছে। অন্যদিকে বেসিক দেশ চীন ও ভারতের ব্যাপক শিল্পায়ন এর জন্য কম দায়ী নয়। তাদের রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, ফলে দূষণও বাড়ছে।

প্রকৃতি একটি শৃঙ্খলিত নিয়মের ভেতর দিয়ে এগোয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই পৃথিবীতে ইকোলজিক্যাল প্রবলেম ঘটে। পৃথিবী বিদ্রোহ করে বসে। হয়ে ওঠে প্রতিশোধপরায়ণ। সাধারণতঃ মনে করা হয়, বায়ুমন্ডলে অতিরিক্তি কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো-কার্বনসহ বিভিন্ন গ্রিণহাউস গ্যাস জমা হওয়ায় পৃথিবীতে অনিয়ম হয়। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমন্ডলের গড় উষ্ণতা বাড়ে। পরিবেশ উষ্ণকরণে তিনটি গ্যাস ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে প্রধান হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড।বাকী দুটো গ্যাস হলো মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। যেহেতু মূল ভূমিকায় থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড। তাই কার্বন নিয়ে এতো মাতামাতি হয়। কার্বনের কিন্তু নিজের নিঃসৃত হওয়ার ক্ষমতা নেই। সে অক্সিজেনের সম্মিলনে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা

বাড়ায়। এই তিনটি গ্যাসকেই সংক্ষেপে বলা হয় গ্রিণ হাউস গ্যাস । গ্রিণ হাউস মূলত কাঁচের ঘরকে বলা হয়। শীতকালে প্রবল শৈতে যখন তাপমাত্রা গাছ, ফুল, শাকসবজি ইত্যাদি বেড়ে উঠার জন্যে অনুকূল নয়, তখন কাঁচের ঢাকনা দিয়ে এই ঘর তৈরি করা হয়। গ্রিণ হাউসের কাচ ভেদ করে সূর্যের আলো এসে এর ভেতরের স্থানকে করে তোলে উষ্ণ। কারণ সূর্যের আলোয় সৃষ্ট উষ্ণতা গ্রিণ হাউসের কাঁচ ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। এই উষ্ণতা গ্রিণ হাউসের ঘেরে আটকা পড়ে। পৃথিবীর উষ্ণ হওয়ার ব্যাপারটা গ্রিণ হাউসের উষ্ণ হওয়ার সাথে মিল থাকায় রূপক হিসেবে পৃথিবীর উষ্ণ হওয়াকে গ্রিণ হাউস বলা হয়। কিন্তু পৃথিবীকে উষ্ণ করে রাখার জন্যে মহাশূন্যে কোন কাঁচের স্বচ্ছ ঢাকনা নেই। যা আছে তা হলো, এমন সব গ্যাসের ক্ষীণ আস্তরণ যা সূর্য রশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে দেয়। কিন্তু এই রশ্মির কারনে পৃথিবী যখন তেতে এই উষ্ণতাকে মহাশুন্যের দিকে পাঠায়, তখন এই গ্যাসগুলো এ উষ্ণতাকে তাদের শরীরে আটকে রাখে। ঠিক যেন গ্রিণ হাউসের কাঁচ। এই গ্যাসগুলোর কারণে পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। ১৮২৯ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ ফুরিয়ারের মাথায় এ ধারনা আসে গ্যাসের বায়বীয় পরিমন্ডলের বাইরে তাপমাত্রা ১৯০ডিগ্রি আর ভূপৃষ্ঠে ১৪.৪ডিগ্রি। কোন গ্রীণ হাউস গ্যাস যদি না থাকত তাহলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হতো ১৯০ডিগ্রি। কোনো জীবনই তাহলে সম্ভব হতো না। ভূপৃষ্ঠ ও বায়বীয় পরিমন্ডলের বাইরে তাপমাত্রার এই তফাতটা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন লেপ মুড়ি দিয়ে আছে। কিন্তু সেই লেপটা কী ? ১৮৬০সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন টিন্ডাল বিভিন্ন গ্যাসের উপর আলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। টিন্ডাল গবেষনায় দেখতে পেলেন, সূর্যরশ্মিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা কয়লা গ্যাস আটকায় না। বস্তুত টিন্ডালের এই গবেষণাই দেখিয়ে দেয় ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার মূল কারণ কী ?

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আগে যা আশংকা করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশী হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের জমাটবাধা বরফ গলছে, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মাঝে আছে বাংলাদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ২২ হাজার ৮৮৯ বর্গকিলোমিটার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনি সতর্কবাণী করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) এক প্রতিবেদনে। এমন ঘটলে বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের কয়েক কোটি

মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। চাষের জমি না থাকায় দেখা দিবে খাদ্য সংকট। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দখল করবে নদী-নালা,খাল-বিল, পুকুর। যেটি অত্যন্ত ভয়াবহ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের চিরাচরিত ধারায় ব্যাপক পরিবর্তনর ফলে মাছের প্রজনন ও বিচরণকে প্রভাবিত করছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কৃষি পানি, স্বাস্থ্য , পরিবেশ ও নদী ইত্যাদি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যদিকে বন্যা, সিডর, আইলা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তবতায় বলা যায় বিপদ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের নয়, বিপদ এখন দোরগোড়ায়।

মানুষ বন্য হয়ে জন্মায় না। কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বন্য করে তোলে। ইউরোপ, আমেরিকার লোকদের বন্যতা তারই প্রমাণ। জাতিসংঘ নামক নাট্যশালার জলবায়ু বিপর্যয় ঠেকাতে কার্যত কোনো উদ্যোগ নেই। তারা আমেরিকায় বসে খেয়ে দেয়ে দিব্যি অলস। পরাশক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে যাওয়াই তাদের প্রধান কাজ।

কিন্তু পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীরা বাঁচতে চায়। পৃথিবীর অধিবাসীদের বাঁচার এই আকুতি কী অনুধাবন করে পুঁজিবাদী বিশ্ব। পৃথিবীর পরাজিত সন্তানেরা কী বাঁচাতে পারবে পৃথিবীকে এই মুনাফাখোর পুঁজিবাদী খপ্পরদের হাত থেকে।

পুঁজিবাদের ব্যর্থতা : নতুন বিশ্বব্যবস্থার উত্থান অনিবার্য

ইমরান প্রস্তুতি নিচ্ছিলো বাড়িতে যাবার, আমি তাকে থামিয়ে বললাম, এবার বাড়ি যাবার চিন্তা বাদ দিয়ে কিছু পড়াশোনা করো। এর একটা কারণও ছিলো, সে দারুণ অনুসন্ধিৎসু। জানাশোনার আগ্রহ তার প্রচুর। মাঝেমধ্যে আমাকে এমন সব প্রশ্ন করে বসে, যার জবাব দিতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়। এবার সুযোগ বুঝে জোর করে পড়াশোনায় বসিয়ে দিলাম। সে পড়তে লাগল, সমজদার পাঠক হতে বেশি সময় লাগলো না তার। পাঠক ইমরানকে এক সময় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শোষণ ভাবিয়ে তুললো, একদিন আমার সঙ্গে তার চিন্তার শেয়ার করতে আলোচনায় বসলো। তার বক্তব্য হলো, আজকের পুঁজিবাদ বিগত সময়ের ভেঙ্গে পড়া কমিউনিজমের মতো দূর্বল এবং আদর্শিকভাবে ব্যর্থ একটি ব্যবস্থা। যেটি পৃথিবীকে শোষণ করছে এবং পৃথিবীর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কিভাবে? ব্যাখ্যা খুঁজলাম আমি। বললো, "কয়েকটি কারণে। প্রথমত, পুঁজিবাদ এই আদর্শ সৃষ্টি করেছে, যে, প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার উপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে অন্য কারো কোনো মানবিক অধিকার নেই। অর্থোপার্জনের সব উপায়-উপকরণ, যা তার আয়ত্বে থাকে, সেগুলো প্রয়োগ করার অধিকার তার আছে।

দ্বিতীয়ত, লাগামহীন মুনাফা অর্জন ও মালিকানার অবাধ স্বাধীনতা। অর্থাৎ মালিকানা অর্জন করতে সব বাধাকে অবমুক্ত করে দেয়া। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা সম্পদ উপার্জন করতে পারে। ইচ্ছেমতো মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ

স্বাধীন। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, লোভী এবং একচ্ছত্র অধিপতিদের মুক্ত করে দেয়া হয়, যারা তাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য নানান পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। বেশি মুনাফা অর্জনের কারণে অর্থনৈতিকভাবে গরীব লোকদের জুলুমের ঘটনা অহরহ ঘটে। ধনী-গরীবের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যে কারণে আমরা সমাজের ভেতর সামষ্টিক সম্পদের আধিক্য এবং অতি দারিদ্রপীড়িত মানুষ উভয়ই দেখতে পাই। একদিকে যেমন সম্পদের পাহাড় গড়া কোটিপতির সংখ্যা প্রচুর, অন্যদিকে তেমনি ময়লা আবর্জনা থেকে জীবিকা সংগ্রহকারী ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

এ ব্যবস্থার লাগামহীনভাবে মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতার কারণে হালাল হারামের কোন পার্থক্য থাকেনা এবং মানবসেবার দিকেও মনোযোগ থাকেনা। এতে যা হয়, সম্পদ বন্টনের পরিবর্তে সম্পদ তৈরি ও বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব থাকে। এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে সমাধা করা হয়। তারা ধরে নেয়, অর্থনৈতিক সমস্যা হলো, পণ্য এবং সেবার চাহিদার বিপরীতে এগুলোর যোগানের অপ্রতুলতা। অর্থাৎ এই সীমিত পণ্য ও সেবাসমূহ মানুষের অসীম প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। যার দরুণ বেশী করে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করার দিকে মনোযোগ থাকে। এতে যাদের সম্পদ আছে তারা এগুলো পেতে পারে, আর যাদের সম্পদ নেই তাদের প্রয়োজন মেটানোরও কোন পথ থাকে না। তাই তো দেখি, পুঁজিবাদ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মেটানোর চেষ্টা করে না। কেননা, সেটা সে অসম্ভব মনে করে।

এ ব্যবস্থায় যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই ভাড়া, মজুরীও পুঁজির হার নির্ধারণ করা হয়। যেমন, কেউ কোনো কারখানা খোলার জন্য প্রথমে তার দরকার জমি, জমি না থাকলে ভাড়া আনতে হবে। তখন এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বক্তব্য হলো, যদি জমি ভাড়া প্রদানকারীর সংখ্যা বেশি হয় আর গ্রহীতা কম হয়, তাহলে জমির ভাড়া কম হবে। আর যদি গ্রহীতা বেশি হয় ভাড়া প্রদানকারীর তুলনায়, তাহলে জমি ভাড়া বেশি হবে। এমনিভাবে কারো কারখানার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন, এক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলে তাদের মজুরী কম হবে আর শ্রমিকের সংখ্যা কম হলে তাদের মজুরী বেশি হবে। অনুরূপ কারখানার যন্ত্রপাতি ও মালামাল কেনার জন্য পুঁজির প্রয়োজন। এখানেও বিনিয়োগকারী বেশি হলে সুদের হার কম হবে আর বিনিয়োগকারী কম হলে সুদের হার বেশি হবে। অর্থাৎ সবকিছুই যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে হবে। এক্ষেত্রে মানুষকে জুলুমের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। শ্রমিকের যোগান বেশি হলে তার পারিশ্রমিক কম হয়, এতে শ্রমিক অত্যন্ত কম টাকায় কাজ করতে বাধ্য হয়। তার ঘাম ঝরানো পরিশ্রম দ্বারা যে পণ্য উৎপদন হয়, তা থেকে এতটুকু অংশও পায় না,

যা দিয়ে সে পরিবার নিয়ে একটু সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে। আর তার মালিকও একথা চিন্তা করে না, যে শ্রমের কারণে তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তাকে সে যা দিয়েছে তা যথেষ্ট কিনা? তার চিন্তা শুধু যোগানের বৃদ্ধিতে কিভাবে তার চাহিদা কম টাকায় পূর্ণ করতে পারে। তার তো কার্যোদ্ধার হচ্ছে, তাতে গরীব মরুক বা ধ্বংস হোক, তার কী যায় আসে?

পুঁজিবাদের মূল কথাই হলো, উন্নয়ন ঘটানো ও অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য অবাধ মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে, তখন সে যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ীই উন্নত ও বেশি মূল্যমানের পণ্য বাজারজাত করতে বাধ্য হবে। এজন্য এ অর্থব্যবস্থায় জনকল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

এ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফার অর্জন খোলামেলা ছেড়ে দেয়া ও এর উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার কারণে অনেক বড় ধরনের অশ্লীলতা সৃষ্টি হয়। মুনাফা অর্জনে হালাল হারামের পার্থক্য না থাকায় নৈতিক অবক্ষয় সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, বেশির ভাগ মানুষ হীন আবেগকে ব্যবহার করে কু-প্রভৃত্তি শান্ত করতে উপকরণ সংগ্রহ করে। এতে সমাজে চারিত্রিক অবক্ষয়ের বিস্তৃতি ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজের নোংরামী ও বেহায়াপনার বড় কারণও এটি। পতিতাবৃত্তি, পর্ণো ছবি, মডেল গার্লস, আর বিজ্ঞাপনে নিজের ছবি ব্যবহার করে ব্যবসা করা, এসবই লাভজনক ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে নৈতিক কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় মানবসেবার প্রতি মোটেও গুরুত্ব থাকে না। হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সুদ, জুয়া সবই এ অর্থব্যবস্থায় বৈধ।

মালিকানার চরম স্বাধীনতার ফলে পুঁজিবাদ এমন এক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে যেখানে অন্যের অধিকার তথা রাষ্ট্রীয় ও গণমালিকানাধীন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা হয়। যেমন এ ব্যবস্থায় বেসরকারী খাতে ব্যক্তি সবকিছুর মালিক হয়।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মালিক ব্যক্তিরা হয় আর মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাজার হয় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত।

আমরা ভাবলে দেখবো, খনিজ কিংবা জ্বালানীর একটি বিশাল খনির মালিকানা আর এক খন্ড জমি অথবা বাড়ির মালিকানা এক নয়। এভাবে পেট্রো কেমিক্যাল প্লান্ট, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট বা অস্ত্র তৈরির কারখানার মালিকানা প্রভৃতির বিপরীতে সুতা বুননের কারখানা বা মিষ্টির দোকানের মালিকানা কখনোই এক নয়। ঠিক সেভাবে রেললাইনের মালিকানা ও গাড়ির মালিকানা এক নয়। অথচ, এ ব্যবস্থায় এভাবেই রাষ্ট্রীয় ও গণমালিকানাতে

দখল প্রতিষ্ঠা করে আছে পুঁজিপতিরা।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদাকরণ। রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা দুই জিনিস, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক কিংবা ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বলতে কিছু থাকবে না। অথচ, মানুষের নির্ভরশীলতা এবং স্রষ্টার প্রতি আস্থা স্বাভাবিক এবং প্রাথমিক ব্যাপার। মানুষ তার জীবনের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার জন্য স্রষ্টার উপর ঠিক সেভাবে আস্থাশীল যেভাবে যে আস্থাশীল আত্মনিবেদন এবং উপাসনার জন্য। কেননা, মানুষের বিষয়াবলীতে তার নিজের দেয়া সমাধানগুলো পরিবর্তনশীল, সাংঘর্ষিক, আত্মপক্ষ সমর্থিত এবং বৈষম্যতায় পরিপূর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় আর তাহলো প্রভুকে বিশ্বাস এবং তার নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা। এ মতবাদ জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করে। যে কারণে ধর্মে বিশ্বাস রাখা নিজস্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে মানুষ তার ইচ্ছেমত যেকোন বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে। পুঁজিবাদ তথা ধর্মনিরপেক্ষতা একদিকে স্রষ্টায়, অপরদিকে যা ইচ্ছা তা করা, এই দুই বিপরীতমুখী ধারণার মধ্যে আপোষের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শের ফলাফল হলো, জনগণের জীবন পরিচালনার জন্য আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে সমাজের চিন্তাবিদ বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক না করে স্রষ্টার আনুগত্যের ভেতর দিয়েই ইসলাম তিনটি বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে শোষণ থেকে মানুষ নিজে বাঁচবে ও অন্যকে বাঁচাবে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এগুলো হলো, খোদায়ী বাধ্যবাধকতা, নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা।

ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : সবধরণের ভোগের প্রয়োজন পূরণের জন্য পুঁজিবাদী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ জন্ম নিয়েছে। এতে সমাজ ও জনগণের ক্ষতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ ব্যবস্থা সুদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর যার একটি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। বেশির ভাগ ব্যাংকই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত এবং বিত্তবান শ্রেণীর একজন ব্যক্তি কিংবা কিছু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ মূলধনী কোম্পানী। ব্যাংকগুলোর প্রধান কাজ হলো, অর্থ দিয়ে মুনাফা হাসিল করা। তারা মানুষের অর্থ জমা রেখে তাদের কম হারে সুদ দেয় অপরদিকে এই অর্থই আবার উচ্চহারের সুদে অন্য মানুষকে ঋণ দেয়। কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান উচ্চহারের সুদের আশায় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও টাকা জমা রাখে।

শেয়ার বাজার ব্যবস্থা : শেয়ার বাজার ব্যবস্থা গোড়া থেকেই একটি ভুল ব্যবস্থা। এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যারা কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে , তারাই

কোম্পানীর মালিক হয় এবং তার বিনিময়ে মুনাফা পেয়ে থাকে। কিন্তু শেয়ার বাজারে যখন শেয়ার কেনা-বেচার জন্য তালিকাভূক্ত করা হয়, তখন এটি একটি নিছক কাগজী পণ্যে গণ্য হয় এবং শেয়ার বাজারে সাধারণ শেয়ার ছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের নানা প্রকারের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনাবেচা হয়।

এখানে বাস্তবিক অর্থে কোম্পানীগুলোর কোন ধরনের অংশ গ্রহণ নেই এবং যারা শেয়ারের মালিক তারা অন্যান্য শেয়ার মালিকের সাথে প্রকৃত পক্ষে সরাসরি চুক্তিতে আবদ্ধ নয়। একজন শেয়ার হোল্ডার অন্য শেয়ার হোল্ডারের কোন খবর জানতে পারছেনা। সে কি করছে না করছে। কাজেই শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে যেহেতু আদৌ অংশীদারিত্বের চুক্তি নেই, তাই এসব কোম্পানী চুক্তি অবৈধরূপে গন্য হতে বাধ্য। আর যারা বেতনের বিনিময়ে কোম্পানী চালাচ্ছে, তারা কোন ভাবেই এগুলোর মালিক নয়। তারা কোম্পানীকে নষ্ট করছে আর কোম্পানীর সব শেয়ার নিয়ে নিচ্ছে।

তাছাড়া শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি কেবল কোম্পানীর লাভ ক্ষতির কারণেই হয় না বরং বাজারের মূল্যসূচকের অস্থিতিশীলতার জন্যও সৃষ্টি হয়, যা শেয়ারের চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। আর প্রতিদিনই এই চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, কারণ প্রতি মূহুর্তেই বাজারে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে। আর এসব তথ্য বা যে কোন আগাম সংবাদ শুনে শেয়ার কেনা-বেচা করা নিছক জুয়া খেলা ছাড়া কিছু নয়।"

ইমরানের এই তথ্যবহুল ব্যাখ্যা শুনে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম। বললাম, তাহলে অর্থ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গী কী?

ইমরান বলতে লাগলো,

"অর্থের ক্ষেত্রে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নীতি ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম মানুষের যাবতীয় মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করে, যাতে সমাজের সব লোক তার টিকে থাকার নিশ্চয়তা পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম মানুষকে তার সামর্থ অনুযায়ী প্রাচুর্য ও ভোগের অনুমতি দিয়ে থাকে। ইসলাম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়েই তুষ্ট থাকেনা বরং প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব অবস্থানে মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করতে পারছে কি না? এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়। সমাজের সামগ্রিক জীবনমান উন্নত হবে কিন্তু প্রত্যেক মানুষ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে সেই উন্নত জীবন মানের সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা পাবে না, এটি ইসলাম যথেষ্ট মনে করেনি।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক সত্তা এবং তার বহু রকমের সম্পর্ক, প্রয়োজন ও চাহিদা রয়েছে। ইসলাম প্রতিটি মানষের অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ

দায়িত্বশীল। যাতে সামাজিক অবস্থানের সাথে মিল রেখে জীবনে সমৃদ্ধি আনতে পারে, ইসলাম এই ব্যবস্থা করে। মানুষ সম্পর্কে এই অপূর্ব ধারণা ইসলামী অর্থনীতিকে অন্য সকল অর্থনীতি থেকে পৃথক বৈশিষ্টে সমুজ্জল করেছে।

ইসলাম ব্যক্তি মানুষকেই উদ্দেশ্য করে মানব সমাজের জন্য অর্থনৈতিক নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করেছে। ব্যক্তি যাতে সমাজে তার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে ইসলাম বিশদ ভাবে নীতিমালা আরোপ করেছে। প্রত্যেক নাগরিক যাতে তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা পায়, ইসলামের আইনগুলো, সে ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম মানুষকে তার নিজের ও তার অধীনস্থ মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দিয়েছে।

সম্পদের সুষম বন্টন, সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ও সম্পত্তি তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, জনগণের সম্পদ, যা রাজস্ব থেকে বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট রাজস্ব জনগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো, কঠিন খনিজ কিংবা তরল খনিজ, যেমন, পেট্রোল অথবা গ্যাস ইত্যাদি এসবগুলোই জনগণের সম্পদ। রাষ্ট্র, কোম্পানী বা ব্যক্তির জন্য এগুলোর মালিকানা বৈধ নয়; বরং এগুলো রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকা জনগণের সম্পদ, যা থেকে অর্জিত আয় খরচ বাদ দেয়ার পর জনগণের মাঝে বন্টন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এগুলো রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহৃত হয়। এ থেকে অর্জিত আয় রাষ্ট্র তার নিজের খরচ বাদে গণমালিকানা বহির্ভূত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগ করবে। এই অর্থ জনগণের মাঝে সম্পদে ভারসাম্য আনার জন্য ব্যয় করা হয়।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ। গণমালিকানাধীন ও রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পত্তির বাইরের সম্পদ সমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে আছে ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতের সম্পদসমূহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে জনগণ একে অপরের অংশীদার, পানি, বিস্তূর্ণ চারণভূমি এবং আগুন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। এখানে আগুণ বলতে জ্বালানী শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। হোক তা কোন গাছের কাঠ, কয়লা বা বিদ্যুৎ হতে প্রাপ্ত জ্বালানী শক্তি। শিল্প, যন্ত্রপাতি, কারখানাতে ব্যবহৃত জ্বালানী গ্যাস ইত্যাদি সবধরনের জ্বালানী অন্তর্ভূক্ত। এ সকল জ্বালানী শক্তির উৎস 'গণমালিকানাধীন' সম্পত্তি। রাষ্ট্র বা কোন ব্যক্তিকে এসব জ্বালানীর শক্তির উৎস নিজস্ব মালিকানাধীন করার অনুমতি দেয়া হবে না। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে দেখা শোনার

দায়িত্ব গ্রহণ করবে আর এ হতে অর্জিত অর্থ প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের পর জনগণের মাঝে বন্টন করা হবে।

এছাড়া মানুষকে সম্পদের অপব্যবহার থেকে বাঁচানোর জন্য সম্পদ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান খুবই সুস্পষ্ট। আমরা দেখি, সম্পদ সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। জমা বা সঞ্চয়ে, বিনিয়োগ বা ব্যয়ে এবং ব্যবসায়িক বিনিময় বা লেনদেনে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই ইসলাম বিস্তারিত বিধিমালা দিয়েছে। এসব বিধি-বিধান এমন যে এর সাহায্যে মানুষ সম্পদকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে । এর দ্বারা সে নিজে লাভবান হবে, অন্যকেও লাভবান করবে। এসব বিধিবিধানের অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সম্পদ ব্যবহারের সেসব প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখা, যার মাধ্যমে মানুষ ধনসম্পদের দাসে পরিণত হয়, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়- মানুষ বাড়ী বানানো, সম্পত্তি ক্রয় করা, হজ্ব বা ধর্মীয় বিশেষ কোন কাজের জন্য সম্পদ জমা করতে পারে। তার এই জমা করাটা বৈধ, যদি সে প্রতি বছর নিসাব সাপেক্ষে এর উপর আসা যাকাত আদায় করে। কিন্তু কেউ যদি মজুতদারীর উদ্দেশ্যে কোন কিছু জমা করে, তাহলে তা অবশ্যই অবৈধ হবে।

অর্থ, শেয়ার বাজার ও সুদ প্রসঙ্গে ইসলাম : ইসলাম স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মুদ্রারমান হিসেবে স্থির করেছে। স্বর্ণও রৌপ্য মানের ভিত্তিতেই নগদ অর্থের লেনদেন ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হবে। একই ভিত্তিতে শ্রমের জন্য মজুরীও দেয়া হবে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী এক দিনার সমান ৪ দশমিক ২৫ গ্রাম স্বর্ণ এবং এক দিরহাম সমান ২ দশমিক ৯৭৫ গ্রাম রৌপ্য। ইসলাম মুদ্রার বিষয়গুলোকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। এই মুদ্রা ব্যবস্থার অধীনে ইসলামী শাসনের সুদীর্ঘ সময়ে কখনো কোনরূপ অর্থসংকট তৈরী হয়নি। বর্তমান যুগে এসে এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণের উপায় হিসেবে বেঁধে দেয়ার ফলে প্রতিনিয়ত সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রেটন উড পদ্ধতির আওতায় মুদ্রার মান হিসেবে স্বর্ণের সাথে ডলারকেও গ্রহণ করা হয়। '৭০ এর দশকে স্বর্ণকে বাদ দিয়ে ডলারকে একমাত্র মুদ্রামান হিসেবে মেনে নেয়া হয়। ফলে ডলার সারা বিশ্বে একক ক্ষমতা বিস্তার করে। এর ফলাফল এই হয়, যখন মার্কিন অর্থনীতি দুর্বল হয়ে ডলারের দাম কমে যায়, তখন অন্য সকল দেশের অর্থনীতির উপরও মারাত্মক ধাক্কা লাগে। এর কারণ হল, প্রত্যেক দেশের ছাপানো মুদ্রার বিপরীতে তাদের কাছে ডলার জমা থাকে। আর এই ডলারের মূল মূল্য হচ্ছে ডলার যে কাগজে ছাপা হয়, সে কাগজের মূল্যের বরাবর। বাস্তবে তারা ডলারের বিনিময়ে যা

দেয়, সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া অন্যদেশের কিছুই করার থাকে না ।
কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণকে আবারো একমাত্র মুদ্রামান হিসেবে স্থির করা না হবে, ততক্ষণ পৃথিবীতে একের পর এক অর্থ সংকট তৈরী হতে থাকবেই । এছাড়াও ডলারকে ঘিরে যদি কোন সংকট বড় রাষ্ট্রে তৈরী হয়,তার নেতিবাচক প্রভাব অন্যা রাষ্ট্রের উপরও পড়তে বাধ্য । শুধু ডলার নয়, যে কোন দেশের কাগজে মুদ্রার কারনে অনুরুপ সংকট তৈরী হবেই । আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব মতে গত ত্রিশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রায় শতাধিক অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়েছে ।
সুদ প্রসঙ্গ : ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সুদকে নিষেধ করেছে । সুদ ভিত্তিক লেনদেন করা আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর । সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ব্যাপকমাত্রার শোষণ ও বঞ্চনার জন্ম দিয়ে থাকে । সুদের ভিত্তিতে গৃহীত ঋণ অধিকাংশ ঋণগ্রহীতার জন্য দুঃখ দুর্দশা ও কঠিন পরিস্থিতির কারণ হয় ।
বর্তমান আর্থিক সংকটের পেছনে যতসব উপাদান কাজ করছে তার মধ্যে সুদের হার অন্যতম । যখন সুদের হার বাড়ানো হয়, তখন ঋণ গ্রহীতার সামর্থের উপর এটি চাপ সৃষ্টি করে । ফলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় । বর্তমান এই সংকটে যারা বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করছে, তাদেরকে প্রথম বছর ৭ শতাংশ এবং দু'বছর পর ৯ দশমিক ৫ শতাংশ সুদ দিতে হয় । এ কারণে ঋণ গ্রহীতার উপর চাপ বাড়তে থাকে । এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন মিলিয়ন লোক তাদের মাসিক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় ।
শেয়ার বাজার প্রসঙ্গ : সুদভিত্তিক ব্যবস্থা যেভাবে ঋণের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে সম্পদ জমা ও সীমাবদ্ধ রাখে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্টক এক্সচেঞ্জগুলো একই ভূমিকা পালন করে । এই স্টক এক্সচেঞ্জগুলো প্রকৃত সম্পদ, পণ্য ও সেবার বিনিময়ের পরিবর্তে মানুষের লাভ-ক্ষতি কিছু সংখ্যা ও কাগজের আদান প্রদানের উপর নির্ভরশীল করে দেয় । এ ব্যবস্থায় সম্পদের পরিমাণকে ফুলিয়ে অনেক বড় করে দেখানো হয়, যার সাথে পণ্য ও সেবার প্রকৃত উৎপাদনের কোন সম্পর্কই থাকে না । ইসলামে যে সম্পদ বিক্রেতার মালিকানাধীন নয়, তা বিক্রয়ের অধিকার নেই । কাজেই যে সম্পদ কেনা হয়েছে কিন্তু এখনো হাতে আসেনি, তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ । স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ম হচ্ছে শেয়ার এবং দ্রব্যাদী অনেকবার কেনা-বেচা হয়, অথচ এগুলো কখনো স্থান পাল্টায় না, ক্রেতা-বিক্রেতা কারোর হস্তগতও হয় না ।
মোটকথা, ইসলামী অর্থনীতি মানুষ ও পৃথিবীকে সুন্দর সাম্যবাদী জীবনব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত করে । এতে প্রতারণা, ঠকবাজী কিংবা কোন রকমের

অসংগতি নেই। ইসলামী অর্থনীতি সকল সক্ষম নাগরিককে কাজ পাবার গ্যারান্টি দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম হচ্ছেন দায়িত্বশীল, আর সকল নাগরিকের ভার তারই উপর (সহীহ বুখারি)। যে কারণে ইসলাম রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীদেরর জবাবদিহীতা নিশ্চিত করে। বাজারে কেউ ওজনে কম দিচ্ছে কিনা বা কেউ প্রতারণা করছে কিনা দেখাশোনা করেন একজন বাজার নিয়ন্ত্রক। তিনি জনগণের অর্থ ও চুক্তি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করেন। ইসলামী রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় তাকে বলা হয় কাজী।
ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে তার জন্মের পর থেকে গণমালিকানাধীন সম্পদে তার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেয়। গরীব ও দুস্থদের খাদ্য ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। প্রত্যেক সক্ষম নাগরিককে কাজের নিশ্চয়তা দেয়। প্রতিবন্ধী ও অক্ষমদের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
ইসলামী রাষ্ট্র তার মালিকানাধীন সম্পত্তিতে দরিদ্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করে। অবৈধ চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মাল্টিন্যাশনাল ও লিমিটেড কোম্পানীর শোষণমুক্ত, নিজের মালিকানা বিহীন সম্পদের বিক্রয় মুক্ত, অনুৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় নিষিদ্ধমূলক ব্যবস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জের কারসাজী মুক্ত, মানুষকে শোষণকারী ক্রেডিট কার্ড, বন্ড এবং প্রতারণামূলক শেয়ার পদ্ধতি মুক্ত, মজুতদার, জুয়াড়ী, সুদখোর ও সর্বপ্রকার প্রতারণামুক্ত অর্থব্যবস্থাই ইসলামী অর্থনীতি।"
শেষ পর্যায়ে ইমরান পুঁজিবাদের ব্যর্থতা খোদ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রবক্তাদের মুখ থেকেই শোনালো, বললো, "রজার টেরি তার বই 'ইকোনোমিক ইনসোনিটি'তে লিখেছেন, মার্কিনীরা জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তারা জানে না এই সমস্যাটি কেন। তারচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা জানে না সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করতে হবে। সর্বোপরি তারা যেটা পারে তাহলো, এই ব্যাধির লক্ষণগুলোর দিকে ইঙ্গিত করতে। যে সমস্ত সমাধানের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মূল সমস্যা। সমস্যাটি লুকায়িত আছে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে। আংশিক কিংবা জোড়াতালি দেয়া সমাধান এই সমস্যার উপশম করতে পারবে না। আমরা যদি কাংখিত লক্ষ্যে পৌছুতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সমস্যাগুলোকে তাদের শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। সামান্য কিছু পাতা ঝেড়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়; আমাদের দায়িত্ব হলো আমাদের ব্যবস্থার ভিত্তিমূল (ঋড়ুঁহফধঃরড়হ) এবং ধারণা সমূহ (Assumptions) মূল্যায়ন করা এবং এর প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত করা।'

উইলিস হারমান বলেছিলেন, ‘এটা বুঝা যাচ্ছে যে, পূঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষতগুলোকে ঢেকে দেয়াই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত ঘটনা তার থেকেও গভীরে। এ জন্য প্রয়োজন এ ব্যবস্থার মৌলিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, ‘কোম্পানীগুলোকে মুকুট পরানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে সমাজের উঁচুমহলে ব্যাপক দুর্নীতি শুরু হবে। অর্থের ক্ষমতা (গড়হবু চড়বিৎ) দেশের মানুষের পক্ষপাত দুষ্টতার সুযোগ নিয়ে দেশের উপর তার শাসন দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস পাবে যে পর্যন্ত না সমস্ত সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয় এবং প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়।”

এসব পর্যালোচনা প্রমাণ করে শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়তে হলে, মানব জাতিকে বাঁচাতে হলে এই পতনোন্মুখ পূঁজিবাদের বদলে প্রাণবান নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার উত্থান এ মূহুর্তে অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

পাঠসূত্র

আনু মুহাম্মদ : বিশ্বায়নের বৈপরীত্য
প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটন : দি ক্র্যাশ অব সিভিলাইজেশন
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ভরসার জায়গাজমি
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী : মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন
মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানি : ইসলাম আওর জাদীদ মা'য়িশাত ও তিজারত
ইয়াসির নাদীম : গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম
পল ডরমাস : দ্য মিথ অব দ্য গ্লোবাল কর্পোরেশন
আবুল আলা মওদুদী : ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
বদরুদ্দীন উমর : সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্ব ব্যবস্থা .
কাভালজিৎ সিং : বিশ্বায়ন : কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন
সৈয়দ মবনু : দ্রাবিড় বাংলার রাজনীতি

Globalisation : its effects and requirements : Mustafa hamdi Al- shathili Al- Ayari : `The Arabic world and the phenomenon Of globalization-the fantasy and the reality' Al-muntada magazine,issue # 140-may 1998, Muntada Al-fikr Al-Arabi . Amman-jordan .
Dr. Ali Ahmed `Ateeqah : `Globalisation : The New Empire' Al-muntada magazine e, issue # 145-October1992
Sayyar Al-Jameel, The Arab Future magazine, issue # 217 – 1997: "Globalisation: The entering of the west into the Asian peoples. The changes in the old world order: a futuristic look
John perkins : The secret history of the american empire.
John perkins : Hoodwinked.

আবুযর রেজওয়ান অতি প্রেমী অতি রাগী এক যুবক। তার ভেতরে প্রেম ও দ্রোহ পাশাপাশি বাস করে। উম্মাহ-প্রেমে তন্ময় থাকে সারাক্ষণ সে। কবিতা দিয়ে লেখালেখির চাকা ঘুরতে শুরু করলেও সেটি এখন বাস করছে প্রবন্ধের বাড়িতে এসে। ১৯৮৬ সালের ১৫ জুলাই সিলেট শহরে তার জন্ম। গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের উত্তর বুধপাশায়। আট ভাইবোনের মধ্যে আবুযর রেজওয়ান দ্বিতীয়। তার পিতা মাওলানা মনিরুল ইসলাম খান একজন নিভৃতচারী আলেম। মা মরিয়ম জামিলা খাতুন রাজনগর উপজেলার বিশিষ্ট আলেম মরহুম আবদুল গনি চান্দু মৌলভীর মেয়ে। রেজওয়ানের ডাক নাম মামনুন। তার কোনো এক চাচি আদর করে নাকি রেখেছিলেন এ নাম।

ফায়যুর রাহমান
সাব এডিটর, দৈনিক শ্যামল সিলেট
ই-মেইল : fayzursyl@gmail.com